সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ফেব্রুয়ারি ২০১৭

২১ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ ভারতের ৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

পরে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করে শোনান হাই কমিশনার। অনুষ্ঠানে ভারত থেকে আগত বিশেষ সেনা ব্যান্ড দল জাতীয় সংগীত এবং দেশাত্মবোধ সংগীতের সুর পরিবেশন করে এবং ঢাকায় বসবাসরত ভারতীয় শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে

২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ ভারতের ৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক গণ-সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, মিডিয়াব্যক্তিত্ব, সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ পঁয়তাল্লিশ | সংখ্যা ০২ | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৩ | ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

চোখজুড়ানো খাজুরাহো ॥ পৃষ্ঠা: ৪১

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	বিশ্ব হিন্দি দিবস ২০১৭	০৪
	রাজশাহী শহর টেকসই উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক	০৫
	বাংলাদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন নেই	০৬
নিবন্ধ	একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	০৭
	জয়তু রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ॥ মাহবুবুর রহমান	৯
	গান যখন ছবির প্রাণ ॥ এমিলি জামান	১৯
ছোটগল্প	বিজয়িনী ॥ ড. দুলাল ভৌমিক	১১
	যে আমার সে কি আমার? ॥ শেলী সেনগুপ্তা	১৩
	কক্ষচ্যুত ॥ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭
প্রবন্ধ	হীরক রাজার দেশে ॥ বিধান রিব	১৫
উচ্চ শিক্ষা	বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ	১৮
সৌহার্দ	অপূর্ব শেকড়-সন্ধান ॥ হিমাদ্রিশেখর সরকার	২১
কবিতা	বেলাল চৌধুরীর একগুচ্ছ কবিতা	২৫
ধারাবাহিক	তর্পণ ॥ ঋতা বসু	২৬
রাজ্য পরিচিতি	মণিপুর	৩১
ভ্রমণ	চোখজুড়ানো খাজুরাহো ॥ অমিতাভ ঘোষ	৪১
অনুবাদ গল্প	সুনামি ॥ জয়ন্ত সাংকৃত্যায়ন	৪৬
শেষ পাতা	ঋত্বিককুমার ঘটক	৪৮

০৭ থেকে ০৮

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনগণের এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পরিচিত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। এই দিনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন।

কানাডার দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ সালে আবেদন জানান। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের উপস্থাপনায় ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

দূরে থাকতে রাজি নই

আমার প্রিয় পত্রিকা *ভারত বিচিত্রা* চার দাশকের অধিক সময় অতিক্রম করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সমবয়সী এই পত্রিকাটি সম্পূর্ণ রঙিন অবয়ব অর্জনের বহু পূর্বেই এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। *ভারত বিচিত্রা*কে আমি পরিপূর্ণ সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সাময়িকপত্র বলে মনে করি। জন্ম বছর থেকেই আমি এর একজন অনুরাগী পাঠক ও গ্রাহক। ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত নিজের নামেই পত্রিকাটি পেতাম। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি সমিতির সভাপতি হিসেবে পেয়ে আসছি।

১৯৭৩ সালের শেষ পর্যায়ে একটি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পাই। একই সময়ে বাংলা একাডেমির সঙ্গে পরিচিত হই। খুব সহজেই বাংলা একাডেমির সদস্য তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ আসে। আমার জীবন সদস্য নম্বর ৬৮১। একাডেমির সংগ্রহশালা ঘাঁটাঘাঁটি করে বিশাখ দত্ত রচিত সংস্কৃত নাটক *মুদ্রারাক্ষস*-এর সন্ধান পাই। জানা যায় চাণক্য ওই নাটকের প্রধান চরিত্র। মহাপণ্ডিত বীর যোদ্ধ চাণক্য আমার পরম কাঙ্ক্ষিতদের অন্যতম। তাঁর সন্ধান পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকায় মনে হতাশা নেমে আসে। কিছু কালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠে সক্ষম জনৈক রণজিৎ শর্মাকে খুঁজে পাই যিনি পূর্বেই সংস্কৃত রচনার কিছু বাংলা রূপান্তর করে খ্যাতিমান হয়েছেন। আমার বিশেষ অনুরোধে এবং বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালকের ঐকান্তিক সহযোগিতায় *উত্তরাধিকার* পত্রিকার ১৯৯৩ সালের একটি সংখ্যায় *মুদ্রারাক্ষসে*র বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ নাটক থেকে আমরা উৎসাহী পাঠকেরা কৌটিল্য ওরফে চাণক্য ওরফে বিষ্ণুগুপ্তের সংখ্যক পরিচয় পেলাম। এর প্রায় ১৬ বছর পর ২০০৯ সালের আগস্ট সংখ্যা *ভারত বিচিত্রায়* চাণক্যর *অর্থশাস্ত্রে*র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের শতবর্ষপূর্তির সংবাদ প্রতিবেদন আমার আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। *অর্থশাস্ত্র* নামক মহাগ্রন্থের নামটি আমরা শুধু জেনে এসেছি। কী আছে ওই গ্রন্থটিতে তা জানার আগ্রহ আজ প্রবলতর হয়ে উঠছে। শুনেছি ওই গ্রন্থের ইংরেজি ভাষান্তর প্রকাশিত হয়েছে। কত বছরে ওই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হবে কিংবা আদৌ তা হবে কি না– বলা দুঃসাধ্য। *ভারত বিচিত্রা*র অগণিত পাঠকের পক্ষ থেকে আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ– অনুগ্রহপূর্বক *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থটির আবিষ্কারক এবং ইংরেজি অনুবাদক শামশাস্ত্রীজীর ইংরেজিতে অনুবাদকৃত গ্রন্থের অন্তত দুটি পৃষ্ঠা *ভারত বিচিত্রা*র আগামী কোনও এক সংখ্যায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করবেন। ৪৩/৪৪ বছরে *ভারত বিচিত্রা*র কাছে আমরা পাঠকেরা যা পেয়েছি তা আশাতীত। মুনি-ঋষি সমাজসেবক নবীন প্রবীণ কবি সাহিত্যিক শিল্পী জ্ঞানী বিজ্ঞানী– তাঁদের জীবন ও কীর্তিগাথা, তীর্থকেন্দ্র, স্থাপত্যশৈলী ইত্যাদির বর্ণময় পরিচিতি পাঠকদের জানার সীমানা সম্প্রসারণের সুযোগ করে দিয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক সংখ্যাগুলো ভারতীয় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সচিত্র বর্ননা বিজ্ঞানমনস্ক হতে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতের রাজ্যসমূহের পরিচিতি, অন্যান্য ভাষার প্রখ্যাত গল্পকারদের বাংলায় রূপান্তরিত পাঠ আমাদের অনাবিল আনন্দ দেয়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের ধারাবাহিক স্মৃতিকথা *একবচন বহুবচন*, চিরশ্রী বিশীচক্রবর্তীর *ছায়ার পাখি* অপূর্ব মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে। প্রধান কবি বেলাল চৌধুরীর সম্পাদকের স্মৃতিচারণের ভাষারূপ বারবার পড়েও তৃপ্তি মেটে না। কালজয়ী কথাশিল্পীদের বেশ কিছু উপন্যাসের আলোচনা আমরা *ভারত বিচিত্রায়* পাঠের সুযোগ পাই। কিন্তু সতীনাথ ভাদুরীর *ঢোড়াই চরিতমানস*; সমরেশ বসুর *দেখি নাই ফিরে*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়*, *প্রথম আলো*, *পূর্ব-পশ্চিম* ইত্যাদি মহাকাব্যতুল্য উপন্যাসের আলোচনা *ভারত বিচিত্রায়* কেন যে আসে না– ভেবে বিস্মিত হই।

ভারতের রাজ্যসমূহের পরিচিতি, অন্যান্য ভাষার প্রখ্যাত গল্পকারদের বাংলায় রূপান্তরিত পাঠ আমাদের অনাবিল আনন্দ দেয়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের ধারাবাহিক স্মৃতিকথা *একবচন বহুবচন*, চিরশ্রী বিশীচক্রবর্তীর *ছায়ার পাখি* অপূর্ব মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে। প্রধান কবি বেলাল চৌধুরীর সম্পাদকের স্মৃতিচারণের ভাষারূপ বারবার পড়েও তৃপ্তি মেটে না।।

পাঠকচিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিশেষ সংখ্যাগুলো *ভারত বিচিত্রা*র সম্পাদকের অভিনব এবং প্রশংসিত উদ্যোগ। সার্ধশততম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সংখ্যা, মহাত্মা গান্ধী স্মারক সংখ্যা, দুই দেশের গল্পসংখ্যা, আষাঢ়ে গল্প, ব্রতচারী, যোগব্যায়াম, ভ্রমণ, শিল্পকলা, ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর স্মরণে বিশেষ সংখ্যাসহ সবক'টি বিশেষ সংখ্যা এক একটি হীরক খণ্ডতুল্য।

২০১৬ সালের একটি সংখ্যাও পাইনি। দয়া করে সবগুলো সংখ্যার এক কপি করে *ভারত বিচিত্রা* পাঠাবেন। ৬/৭ মাস আগে পাঠক তালিকা হাল নাগাদ করার লক্ষ্যে অন্যের কাছ থেকে সংগৃহীত একটি কুপন পূরণ করে পাঠিয়ে ছিলাম। কোনও ফল পাইনি। এখন মনে হচ্ছে, পত্রিকার ঠিকানার পরিবর্তন হওয়ায় এমন হয়েছে। *ভারত বিচিত্রা* থেকে দূরে থাকতে আমি মোটেও রাজি নই। আমার দূরবর্তী এক বন্ধুর দেয়া (যা ২/৩ দিন হল পেয়েছি) সর্বশেষ কুপন পূরণ করে পাঠালাম। অনুগ্রহ করে আমার নাম ঠিকানা নতুন পাঠক/গ্রাহক তালিকাভুক্ত করবেন। অতঃপর *ভারত বিচিত্রা* এবং এর পরিশ্রমী কর্তৃপক্ষের মঙ্গল কামনা করি।

মুহম্মদ আবদুল মতীন অধ্যাপক
গোডাউন রোড, মোকামতলা
ডাকঘর– মোকামতলা, উপজেলা– শিবগঞ্জ
বগুড়া

এমন পাঠকই চাই...

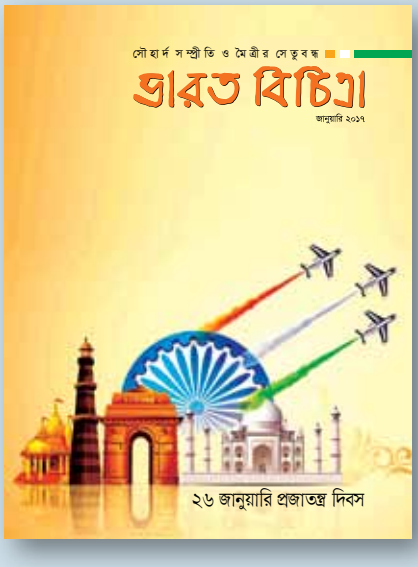

আমরা এমন পাঠকই চাই যাঁরা প্রতিটি সংখ্যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে মূল্যায়নধর্মী আখ্যান তৈরি করে আমাদের কাছে পাঠাবেন! আপনার সুচিন্তিত দীর্ঘ পত্রটি যেন আমাদের পিপাসিত বুকে তৃষ্ণার জল! দেখুন, আমরা সারামাস কষ্ট করে, খেটেখুটে এক-একটি সংখ্যা তৈরি করে আপনাদের সামনে হাজির করি, যাতে আপনাদের একটু ভাল লাগে। জানি, অর্বাচীনদের কাছে এর কোন মূল্য নেই, সে প্রত্যাশাও করি না, কিন্তু কখনও কখনও আপনাদের মত দু'একজন মানুষ চিঠি পাঠিয়ে আমাদের ঠিকই জানিয়ে দেন যে, আপনাদের ভাল লেগেছে। বুঝতে পারি, আমাদের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। পাঠক মনোরঞ্জনের কথা না ভেবে পাঠক তৈরির চেষ্টা করেছি এতকাল, আপনার চিঠি যেন তারই স্বীকৃতি। প্রসংশা নয়, মূল্যায়নধর্মী মতামত পাঠিয়ে আমাদের নতুন নতুন পথের সন্ধান দিন। আপনার মত পাঠক যে কোন পত্রিকার জন্য মহার্ঘ্য। ভাল থাকুন।
– সম্পাদক

অপেক্ষার প্রহর

অপেক্ষার প্রহর যেন ফুরোয় না– কবে *ভারত বিচিত্রা* আসবে। কখনো পোস্ট অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আবার কখনো পিয়নকে বিরক্ত করার যেন কমতি নেই। হঠাৎ পাঠাগারের দরজা খুলেই দেখা যায় চৌকাঠের ফাঁকা দিয়ে রাখা *ভারত বিচিত্রা*। বইখানা পেয়ে অধীর আগ্রহের অপেক্ষায় থাকা মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় ২০১৬ সালের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি/মার্চ/জুন/জুলাই এই সংখ্যাগুলো আমাদের কাছে পৌঁছয়নি। ইতোপূর্বেও আপনার বরাবর অনুরোধ করেছিলাম এ সংখ্যাগুলো পাঠানোর জন্য। আবারও অনুরোধ করছি যদি এই সংখ্যাগুলো আপনাদের সংগ্রহে থাকে তাহলে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে চিরঋণী করবেন।

অন্যদিকে *ভারত বিচিত্রা*র পৃষ্ঠা কেটে ইংরেজি ব্লক লেটারে ঠিকানা লিখে দ্রুত পাঠানোর কথা বলেছেন। আমরা এমন মূল্যবান বইটির পৃষ্ঠা না কেটে পাঠাগারের প্যাডে ঠিকানা লিখে পাঠালাম।

নিরঞ্জন মিত্র
সভাপতি, শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন পাঠাগার
গ্রাম+ ডাকঘর– উত্তর সোনাখালী
উপজেলা– মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর

সম্পাদকীয়

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? ফেব্রুয়ারি আমাদের অবধারিতভাবে মনে করিয়ে দেয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের কথা। রফিক, শফিক, সালাম, বরকতের সেদিনের রক্তভেজা সরণী বেয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় ঘটে বিশ্ব মানচিত্রে– বাংলাদেশ যার নাম। সেই অমর শহীদদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আত্মবিসর্জনের স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শাখা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে বিশ্বের তাবৎ বাঙালিকে পরম গৌরব ও সম্মান দান করেছে। কানাডার দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ সালে আবেদন জানান। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের উপস্থাপনায় ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারির বেদনাবিধুর ঘটনার দু'বছর পরে আরেকটি বেদনাবহ ঘটনার সাক্ষি হই আমরা। ১৯৫৪ সালে কলকাতার জনারণ্যে ট্রাম দুর্ঘটনায় একজন মানুষ প্রাণ হারান। মানুষটির চোখে স্বপ্ন আঁকা ছিল। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। এই মানুষটি কবি ছিলেন– নিভৃতচারী নিঃসঙ্গ একজন কবি। তারপর গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে, তাঁর প্রিয় ধানসিড়ি নদী বর্ষায় ঋতুমতী হয়েছে, শীতে নিঃস্ব হয়েছে, শঙ্খচিল শালিখের দেশে কার্তিকের নবান্ন এসেছে, কাঁঠাল পাতায় ভোরের কুয়াশা ঝরেছে টুপটাপ শব্দে, কবির আকাঙ্ক্ষা আবার আসিব ফিরে এই বাংলায় ফলবতী হয়েছে। নশ্বর কবি অতীন্দ্রিয়লোক থেকে ফিরতে পারেননি বটে কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর কবিতা ফিরে এসেছে তীব্রভাবে, বাঙালির চৈতন্যে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে। কবির নাম শ্রীজীবনানন্দ দাশ– জন্ম তাঁর ফেব্রুয়ারি মাসে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি এ বছরের জুলাই মাসে ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নিতে চলেছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধশালী। ২০১২ সালের ২৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর দায়িত্ব পালনকালে তিনি ভারতের গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন, বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। এবারের সংখ্যায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলাদেশের এক সাবেক সেনাপ্রধান।

এই ফেব্রুয়ারিতেই জন্মেছিলেন এক মহাসাধক। সরল ভাষায় ধর্মতত্ত্বকে এই আত্মভোলা মহামানব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মানুষের মাঝে। আর তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য সেই বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। এই পুণ্যলগ্নে সেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

বিশ্ব হিন্দি দিবস ২০১৭

১০ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বিশ্ব হিন্দি দিবস পালন করে। অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অতিথিবৃন্দ এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট ও ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের হিন্দি ভাষা শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

হিন্দি ভাষার জন্য একটি আইসিসিআর চেয়ার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর পক্ষে ভারতীয় হাই কমিশনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এ উপলক্ষ্যে হাই কমিশনার ও উপাচার্য যৌথভাবে বাংলাদেশে প্রথম হিন্দি ই-ম্যাগাজিন উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের মেধাবী হিন্দি ভাষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

হাই কমিশনার আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের হিন্দি বিভাগে ব্যবহারের জন্য দুটি কম্পিউটার উপহার দেওয়ার ঘোষণা দেন।

হাই কমিশনার তাঁর ভাষণে ২০১৬ সালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এক-বছর মেয়াদী হিন্দি কোর্স চালু করায় ইনস্টিটিউটের প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ৭ জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে হিন্দি বিভাগের উদ্বোধন করেন। তিনি আগ্রার কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থায় বিদেশে হিন্দিভাষা প্রসার প্রকল্পের আওতায় পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের দু'জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আগ্রার কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থা হচ্ছে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত একটি স্বনামধন্য হিন্দি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হাই কমিশনার এ বছর এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দশে উন্নীত করারও ঘোষণা দেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতের উন্নয়নে অনাবাসী ভারতীয়দের অবদানের কথা স্মরণ রেখে প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ১৮৯৫ সালের এই দিনে মাহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন, যার ফলে ভারতীয়দের জীবনে চিরস্থায়ী পরিবর্তন আসে। এবছর ৭-৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় কর্নাটকের ব্যাঙ্গালুরুতে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন এক মনোজ্ঞ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের ১৪শ সংস্করণের সকল চলতি খবর পেতে ক্লিক করুন এমইএ ইউটিউব চ্যানেলে (https://www.youtube.com/user/MEAIndia)। বিভিন্ন অধিবেশনের পূর্ণ ভিডিও দেখতে পাবেন এই (mymea.in/bj1) সাইটে

১৩ জানুয়ারি ২০১৭ ভারতের নুমালীগড় শোধনাগার থেকে ২২০০ টন ডিজেলসহ ৪২টি তেলবাহী গাড়ি পার্বতীপুর ডিপো (বাংলাদেশ) হয়ে বাংলাদেশে এসে পৌঁছয়

রাজশাহী শহর টেকসই উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক

২৯ জানুয়ারি ২০১৭ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা রাজশাহী শহরে এসে প্রথমে নগর ভবন পরিদর্শন করেন। এখানে 'রাজশাহী শহর টেকসই উন্নয়ন'-এর জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২১.৯৫ কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতায় এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় বেশ কয়েকটি ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

এর পরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মাননীয় হাই কমিশনারকে একটি নাগরিক অভ্যর্থনা প্রদান করে, যেখানে তাঁকে প্রথা অনুযায়ী রাজশাহী শহরের একটি প্রতীকী চাবি হস্তান্তর করা হয়। একইদিনে হাই কমিশনার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে একাডেমিক পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হন। সন্ধ্যায় হাই কমিশনার রাজশাহী শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন।

পরদিন অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি হাই কমিশনার সারদাস্থ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি পরিদর্শন করেন। এখানে ভারত সরকার একটি ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ বিল্ডিং ও একটি আইটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্পের জন্য ভারত সরকার ১০.৮৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

সারদায় পুলিশ একাডেমি পরিদর্শন শেষে শ্রী শ্রিংলা নাটোরের কালিবাড়ি পরিদর্শনে যান। এখানে 'এইড টু বাংলাদেশ' প্রোগ্রামের আওতায় ভারত সরকারের ৯৭ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তায় পুনঃনির্মাণ ও নবীকরণ পরিকল্পনার কাজ চলছে। এসময় হাই কমিশনারের সঙ্গে রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার শ্রী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন।

যশোরে হাই কমিশনার

১১ জানুয়ারি ২০১৭ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা যশোরের স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পৌর প্রশাসনের উপস্থিতিতে যশোরে নতুন ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। যশোরের এই ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রটি বাংলাদেশে চালু হওয়া দ্বাদশ ভিসা কেন্দ্র।

নড়াইলে হাই কমিশনার

১১ জানুয়ারি ভারতীয় হাই কমিশনার নড়াইলের

রামকৃষ্ণ মিশনে আরও একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ক্যাডেট স্কুলে ল্যাপটপ ও কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান করেন। এ সময় তিনি ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠিত নড়াইলের সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের ইন্দো-বাংলাদেশ মৈত্রী মহিলা হোস্টেল পরিদর্শনে করেন। ২০১৫ সালের ৭ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি হোস্টেলটির নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন।

খুলনায় হাই কমিশনার

১২ জানুয়ারি হাই কমিশনার খুলনা-মংলা বন্দর সড়ক পরিদর্শন করেন এবং ভারত সরকারের ঋণরেখার আওতায় বাংলাদেশকে প্রদেয় বর্ধিত সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। বিকালে তিনি খুলনা শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

● বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন নেই

বাংলাদেশে বিদ্যমান আটটি ভারতীয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে (আইভিএসিসমূহ) ভারতে যাওয়ার নিশ্চিত টিকিট (বিমান/সড়ক/রেল)সহ বাংলাদেশী ভ্রমণকারীদের সরাসরি ভিসা প্রাপ্তির স্কিমটি বর্ধিত করা হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে এটি কার্যকর হবে। বাংলাদেশী ভ্রমণকারী যাদের নিশ্চিত ভ্রমণ টিকিট রয়েছে তারা কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই সরাসরি আইভিএসি-এর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল শাখায় ট্যুরিস্ট ভিসা প্রাপ্তির এ সুবিধা পাবেন। ঢাকার আবেদনকারীরা তাদের নিশ্চিত ভ্রমণ টিকিট নিয়ে সরাসরি আইভিএসি মিরপুর শাখায় ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) শ্রীমতী মুক্তা ডি. তোমার আজ মিরপুর আইভিএসি পরিদর্শন করেন। শনিবার মহিলাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদন জমাদানের বিশেষ দিবস উপলক্ষে আগত মহিলাদের সাথে তাঁরা মত বিনিময় করেন।

বাংলাদেশী ভ্রমণকারী যারা সরাসরি ট্যুরিস্ট ভিসা পাওয়ার আশা করছেন, তাদের অবশ্যই ভারত যাওয়ার বিমান, রেল অথবা বাস-এর নিশ্চিত টিকিট (যথাযথ অপারেটর কর্তৃক ইস্যুকৃত) থাকতে হবে। ভ্রমণের তারিখ অবশ্যই আইভিএসি-তে ভিসা আবেদনপত্র জমাদানের তারিখের এক মাসের মধ্যে হতে হবে। পরবর্তী বিস্তারিত তথ্য www.ivacbd.com-এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

এই প্রক্রিয়াটি ভারতের ভিসা প্রাপ্তি প্রক্রিয়া চলমান ও সহজীকরণের একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। ২০১৬ সালের অক্টোবরে মহিলা ভ্রমণকারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রথম সারাসরি ট্যুরিস্ট ভিসা স্কিম চালু করা হয় এবং পরে ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এটি সকল বাংলাদেশী ভ্রমণকারীর জন্য বর্ধিত করা হয়। স্কিমটি বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি সহজ করে দিয়েছে। ভারতের নিশ্চিত টিকিট (বিমান, সড়ক, রেল) সহ কোন বাংলাদেশী নাগরিকেরই ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য ই-টোকেন/ অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর প্রয়োজন নেই। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় করা এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য।

শুভ জন্মদিন...

১৫ জানুয়ারি ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান

একই দিনে হাই কমিশনার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমামকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান

সিলেটের আবেদনকারীদের ভিসা সম্পর্কিত তথ্য

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট-এর সকল ভিসা আবেদনকারীকে চট্টগ্রামস্থ সহকারী হাই কমিশনের পরিবর্তে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ভিসা আবেদন পূরণ করার সময় তারা http://indianvisa-bangladesh.nic.in/visa/Registration-এ Bangladesh-Dhaka সিলেক্ট করবেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

নিবন্ধ

একুশে ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনগণের এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পরিচিত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। এই দিনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। বেদনাবিধূর এই দিনটি তাই বাঙালি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।

২০১০ সালে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তা চরম আকার ধারণ করে।

ঐদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্রযুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

তখন থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় 'শোক দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে একাদিক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানের করুণ সুর বাজতে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বেতার, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি

কানাডার ভ্যানকুভারে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ সালে আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করে।

সূত্র উইকিপিডিয়া
অনুবাদ মানসী চৌধুরী

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকারে লেখক

নিবন্ধ

জয়তু রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি

মাহবুবুর রহমান

বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি এ বছরের জুলাই মাসে ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নিতে চলেছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধশালী। ২০১২ সালের ২৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর দায়িত্ব পালনকালে তিনি ভারতের গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন, বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

প্রণব মুখার্জি একজন বাঙালি, একথা ভাবতেই আনন্দে আমার মন ভরে ওঠে। কোন বাঙালির পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। সেই অসম্ভব তিনি সম্ভব করেছেন তাঁর ক্ষুরধার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দিয়ে। তিনি বাংলাদেশের গর্বিত জামাতাও বটে। তাঁর প্রয়াত স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জির পৈত্রিক বাড়ি ছিল যশোরের নড়াইলে। তিনি তখন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর আমন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের এবং তাঁর দুর্লভ সাক্ষাৎলাভের। সেই চমকপ্রদ কাহিনি কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়– আমার স্মৃতির মণিকোঠায় তা সদা ভাস্বর হয়ে থাকবে। তাঁর চরিত্রের যে দিকটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর অমায়িক আচরণ ও স্নেহশীল বিনম্র ব্যবহার। তাঁর মধ্যে আমি একটি নিখাদ বাঙালি মন ও মনন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তিনি চিন্তা-চেতনা আচার-আচরণ ও বেশভূষায় নিশ্চিতভাবে খাঁটি বাঙালি। তাঁর জীবনাচরণে আমি ষোলআনা বাঙালিয়ানা প্রত্যক্ষ করেছি– কোথাও এতটুকুও কৃত্রিমতা দেখিনি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানে তাঁর মনোযোগ আমরা কামনা করছি। সেটি হচ্ছে তিস্তার পানি। তিস্তার পানির ন্যায্য অংশ এখনও বাংলাদেশ পায়নি। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পানির অপর নাম জীবন। তিস্তার পানি পাওয়া না-পাওয়া তাই বাংলাদেশের উত্তর-জনপদের মানুষের মরা-বাঁচার সমস্যা...

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ (২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ১৩ মে ১৯৬২)। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রণব মুখার্জি ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন জীবনের পরিপূর্ণতার এক মহালগ্নে, ছিয়াত্তর বছর বয়সে– ইতোমধ্যে দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন পার করেছেন। একাধারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সব মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভারতকে উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। গোটা ভারতে তিনি সার্বজনীন ব্যক্তিত্ব, সবার কাছে সমাদৃত, শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত। ভারতের পঁয়ষট্টি বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদটি লাভ করেছেন।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালিরাই জ্বালিয়েছিলেন আলোর মশাল। অবিভক্ত বাঙলায় রেনেসাঁর উত্থান ঘটেছিল শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে– যা ভারত ছাপিয়ে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহামতি গোখলে বলেছিলেন, What Bengal thinks today, India will think tomorrow. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে 'বেঙ্গলের' সেই মহান রেনেসাঁর ঐতিহ্যকে ধরে রাখা যায়নি– যুগস্রষ্টা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জ্যোতি বসুকে ভারত যোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি। জ্যোতি বসুকে ভারতের লোকসভা সর্বসম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সিপিএম-এর সম্মতি না থাকায় তিনি দলীয় মতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলাদেশের মানুষ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম– তারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তারা বিজয় ছিনিয়ে এনেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব তারা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের বাঙালি তার শ্রেষ্ঠত্ব জগৎসভায় তুলে ধরেছে। তারা রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে নিয়েছে; তাঁর সোনার বাংলাকে ভালবেসেছে; তাঁর সোনার বাংলা কবিতাকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়েছে। নজরুলের 'চির উন্নত মম শির'-এর চেতনাকে ধারণ করেছে। আর পঁয়ষট্টি বছর পরে হলেও বাঙালি প্রণব মুখার্জি অমিত সম্ভাবনাময় ভারতবর্ষের সাংবিধানিক শীর্ষপদটি অলংকৃত করে বাঙালিদের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

প্রণব মুখার্জিকে বাংলাদেশে দেখেছি ২০০৭ সালে সিডরের ছোবলে যখন বাংলার দক্ষিণাঞ্চল তছনছ হয়ে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক সেই মহাদুর্যোগে লাখ লাখ মানুষ যখন গৃহহারা স্বজনহারা সর্বস্বহারা অসহায়– সান্ত্বনা সহানুভূতি ও সাহায্যের বার্তা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের এই বাঙালি সন্তান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারত মিত্র বাহিনিরূপে পাকিস্তান হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সেদিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তরুণ সহযোগী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে প্রভুত সহযোগিতা করেছিলেন চৌত্রিশ বছরের এই টগবগে যুবকটি। ভারতীয় লোকসভায় তিনি বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের জয়গাথা গেয়েছিলেন; পাকিস্তানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন; ভারতকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আমার মনে পড়ছে, অষ্টম জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে এক সরকারি সফরে ভারতে যাই, প্রণব মুখার্জি তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিলেন ভারতে আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত লিয়াকত আলী ও দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস। সাক্ষাতে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, আপনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনির প্রধান ছিলেন, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। আসুন আমরা দু'জনে বাংলায় কথা বলি। এখানে তো সব সময় এমন সুযোগ হয় না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন ভারতের জাতীয় সংগীত কবিগুরুর রচিত। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও তাঁর রচিত। তিনি কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'-র কয়েক লাইন গড়গড় করে আবৃত্তি করেছিলেন। আমি মুগ্ধচিত্তে বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, "আরো আছে। শেষ লাইন ক'টি আরো সুন্দর, আরো অর্থবহ, আরো হৃদয় নিংড়ানো। 'ওমা তোমার বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি'।"

আমি বলেছিলাম, "আপনি রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথকে আপনি অনেক ভালবাসেন। বাংলাদেশের শ্রীহানি হলে, বাংলামায়ের মুখ মলিন হলে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেতেন, অশ্রুপাত করতেন। বাংলামায়ের মুখ যেন সদা প্রসন্ন থাকে, যেন তার বদন কখনও মলিন না হয় সেজন্য আপনার কাছে আমি বিনীত সহযোগিতা চাইব, শুভ কামনা চাইব...।" তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "আমি নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করব বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে থাকতে, তার কল্যাণে, তার মঙ্গলে যথাসাধ্য করতে।" তাঁর কথাগুলো এখনো আমার কানে অনুরণিত হয়। আমি আজও আনন্দিত বোধ করি, আশান্বিত হই।

২০১২ সালের জুলাই মাসে প্রণব মুখার্জির রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে শান্তি সমৃদ্ধি ও সহযোগিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল; অমীমাংসিত জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানের দিশা পেয়েছিল। ছিট-মহল হস্তান্তর সমস্যা, অপদখলীয় ভূমি, সমুদ্রসীমা ইত্যাদি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভূদের রেখে যাওয়া সমস্যাদির উইন-উইন সমাধান তিনি দিতে পেরেছিলেন।

তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানে তাঁর মনোযোগ আমরা কামনা করছি। সেটি হচ্ছে তিস্তার পানি। তিস্তার পানির ন্যায্য অংশ এখনও বাংলাদেশ পায়নি। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পানির অপর নাম জীবন। তিস্তার পানি পাওয়া না-পাওয়া তাই বাংলাদেশের উত্তর-জনপদের মানুষের মরা-বাঁচার সমস্যা; জীব-বৈচিত্র্যের টিকে থাকার সমস্যা। অনেকবার সমস্যাটার সমাধান হবে হবে করেও তা এখনও অধরাই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের আগেই তাঁর অঙ্গীকারের কথা মনে রেখে তিনি সমস্যাটির চিরস্থায়ী সমাধান দিয়ে যাবেন। দুই প্রতিবেশী দেশের মৈত্রী ও সম্প্রীতির যে বাতাবরণ তিনি তৈরি করেছেন, তার চূড়ান্ত রূপ দিয়ে তিনি তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদনের দলিলে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখে যাবেন। আমাদের বিশ্বাস, এটি একমাত্র রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির পক্ষেই সম্ভব– আর কারো পক্ষে নয়।

আমার মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি রাইসিনা হিলসে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎশেষে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "প্রণবদা আমার শিক্ষক, আমার অভিভাবক, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমি দিল্লিতে আগে কখনও থাকিনি। দিল্লি আমার অপরিচিত। এর রাস্তা-ঘাট কিছুই আমি চিনতাম না। এবারেই আমি দিল্লিতে প্রথম এসেছি। প্রণবদা আমাকে হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে দিল্লি চিনিয়েছেন। আমাকে সাহস জুগিয়েছেন, আশা দিয়েছেন, ভরসার জায়গাটা শক্ত করেছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রদেশের কিছু কিছু সমস্যায় কেন্দ্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থানে বিব্রত হয়েছি। সমাধান দিতে পারিনি। প্রণবদা সকলকে ডেকে সমস্যাগুলো আলোচনায় নিয়ে সমাধান দিতে পেরেছিলেন। তিনি সর্ববিজ্ঞ, সর্বপ্রিয়, সর্বশ্রদ্ধেয়।"

প্রণব মুখার্জিকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা, আমার ভক্তি ও ভালবাসা। দিল্লির সাউথ গেটে আমার কাছে বলা কথাগুলো তিনি রাইসিনা হিলসে গিয়ে ভুলে যাননি। তিনি কথা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস, শুধু আমার কেন, বাংলাদেশের সাড়ে ষোল কোটি মানুষের গভীর বিশ্বাস, তিনি তাঁর দায়িত্বভার ত্যাগের আগে বাংলাদেশ ও ভারতকে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের এক অন্যন্য বন্ধনে আবদ্ধ করে যাবেন– যা কখনও ম্লান হবে না, তমশাচ্ছন্ন হবে না, ঔজ্জ্বল্য হারাবে না। জয়তু প্রণব মুখার্জি।

মাহবুবুর রহমান লে. জেনারেল (অব.) সাবেক সেনাপ্রধান

ছোটগল্প

বিজয়িনী

ড. দুলাল ভৌমিক

‘মা, আমাকে এখানে ফেলে যেও না! আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও!’

মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, ‘আমি নিরুপায়, মা!’

কন্যা বলল, ‘কেন তুমি নিরুপায়?’

মাতা। সমাজের ভয়ে।

কন্যা। সমাজের কিসের ভয়, মা?

মাতা। তোমার কোন পিতৃপরিচয় নেই। এই ভয়।

কন্যা। আমি তোমার মেয়ে। এ-ই তো আমার পরিচয়।

মাতা। সমাজ তা স্বীকার করবে না।

কন্যা। একটি নবজাতককে রক্ষা না করে তাকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করছে, অথচ তার মাতৃপরিচয়কে স্বীকার করবে না! এ কেমন সমাজ, মা? কারা এ সমাজ নির্মাণ করেছে?

মাতা। যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, মানুষরূপী সেই অমানুষরা।

কন্যা। মা, আমার জন্মে আমার অপরাধ কি?

মাতা। তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি পবিত্র প্রেমকুসুমের এক ফল।

কন্যা। তাহলে আমাকে ত্যাগ করছ কেন?

মাতা। হৃদয়হীন ও নিয়মপীড়িত এই সমাজে তোমাকে নিয়ে আমি কিভাবে বাঁচব, মা?

কন্যা। তাহলে তুমিই আমাকে মেরে ফেল। শ্বাপদসঙ্কুল নির্জন এই স্থানে আমাকে ফেলে যেও না!

মাতা। জন্মদাত্রী হয়ে আমি তোমাকে মারব কি করে, মা? এ কাজ আর কেউ পারে, মা পারে না!

কন্যা। কিন্তু তুমি আমাকে এখানে ফেলে গেলে হিংস্র প্রাণীরা আমাকে খেয়ে ফেলবে!

মাতা। কিন্তু তোমাকে সমাজে নিয়ে গেলে সমাজ তোমাকে আমাকে উভয়কেই খেয়ে ফেলবে! তার যে নিষ্ঠুর খিদে!
কন্যা। তাহলে কি করণীয়, মা?
মাতা। আমার জীবন দিয়ে আমি তোমাকে বাঁচাব!
কন্যা। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কি করে? তুমি-আমি যে এক নাড়িতে বাঁধা!
মাতা। জন্মদাত্রী হয়ে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না! কিন্তু ধরিত্রী মাতা তোমাকে রক্ষা করবেন! তাঁর সমাজ নেই, আছে হৃদয়!

এই বলে হতভাগিনী মা নবজাতককে ফেলে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এই সুযোগে কতগুলো বিষাক্ত কীট এসে নবজাতককে দংশন করতে লাগল। বিষের যন্ত্রণায় সে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগল। কান্নার শব্দ শুনে কতগুলো বন্য কুকুর সেখানে এসে তাকে দেখতে পেল। তাদের একজন বিস্ময়ে বলল, 'আরে! এ যে মানবশিশু! এ কি করে এখানে এল?'

আরেকজন বলল, 'নিশ্চয়ই এর পিতা-মাতা একে ফেলে গেছে!'
আরেকজন বলল, 'এটা কি করে সম্ভব? আমরা বনের পশু। আমরা তো আমাদের বাচ্চাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারি না! আমাদের বাচ্চাদের আমরা পরম যত্নে লালন-পালন করি। মানুষ তো শুনেছি সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহলে তারা এমন কাজ করল কি করে? এ তো আমি বুঝতে পারছি না!'

এ কথা শুনে আরেকজন বলল, 'আরে ভাই, মানুষ যদি মনুষ্যত্বহীন হয়, তাহলে তারা পশুর চেয়েও অধম হয়। তখন তারা সবকিছুই করতে পারে। আরেকটা কথা মনে রেখ– পশু কখনো মানুষ হয় না, কিন্তু মানুষ পশু হতে পারে। পশু কখনো পশুত্ব ত্যাগ করে না, কিন্তু মানুষ কখনো-কখনো মনুষ্যত্ব ত্যাগ করতে পারে। তাই এখন আমাদের কি কর্তব্য তাই ভাব।'

আরেকজন বলল, 'অবশ্যই আমাদের একে রক্ষা করতে হবে। তুমি ঠিই বলেছ– মানুষ মনুষ্যত্ব ত্যাগ করতে পারলেও পশু পশুত্ব ত্যাগ করতে পারে না। আমরা সেই পশুত্ব দিয়েই মনুষ্যত্বকে জয় করব।'

এরূপ আলোচনা করে তারা সকলে মিলে কন্যাটিকে রক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ সেখানে একটি শৃগাল এল। তাকে দেখে কুকুরগুলো জোরে চিৎকার করে তাকে তাড়িয়ে দিল। এ স্থান থেকে কিছুটা দূরে কয়েকটি বালক খেলছিল। তারা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ শুনে সেখানে ছুটে এল। তারা কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। কিন্তু কন্যাটি বিষের জ্বালায় চিৎকার করছিল। তখন তারা তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেল। চিকিৎসায় কন্যাটি সুস্থ হল।

চিকিৎসায় কন্যাটির পীড়া গেল, কিন্তু সমাজপতিরা এসে হাজির হলেন। তাঁরা বললেন, 'এই মেয়ে! তোমার বাবা কে?'
কন্যা। জানি না।
সমাজপতিরা। তোমার মা কোথায়?
কন্যা। পরলোকে।
সমাজপতিরা। তোমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।
কন্যা। কারণ?
সমাজপতিরা। তুমি অপরাধী।
কন্যা। গত রাতে কেবল আমার জন্ম হল। এর মধ্যে তো আমি কোন অপরাধ করিনি।
সমাজপতিরা। তোমার পিতা-মাতা করেছে।
কন্যা। কিন্তু একের দণ্ড অপরকে দেওয়া– এ আপনাদের কেমন বিধি? তাছাড়া, যাদের জীবনদানে ক্ষমতা নেই, তাদের জীবনহরণেও অধিকার নেই।
সমাজপতিরা। কি! তুমি সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করতে চাও?
কন্যা। সমাজ কে নির্মাণ করেছে?
সমাজপতিরা। সমাজপতিরা।
কন্যা। তাদের উপদেষ্টা কারা?
সমাজপতিরা। নিজেরাই।
কন্যা। তাহলে এটা স্বৈরাচার। আমি স্বৈরাচার মানি না।

কন্যার যুক্তি শুনে সমাজপতিরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁদের এই বোধ হল যে, কারো জীবন রক্ষায় তাঁদের অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু জীবনহরণে নয়। মেয়েটি ঠিকই বলেছে। তাই তাঁরা নতমস্তকে চলে গেলেন। এমনি সময়ে এক নিঃসন্তান জননী এসে কন্যাটিকে তাঁর হৃদ্‌মন্দিরে নিয়ে গেলেন।*

* গল্পটি ঢাকার একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং দিল্লির সাহিত্য একাডেমির সংস্কৃত পত্রিকা *সংস্কৃতপ্রতিভা*-র অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় মুদ্রিত।

দুলাল ভৌমিক
শিক্ষাবিদ প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ ফেব্রুয়ারি

জগজিৎ সিং আরোরা

০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ❖ হাসান আজিজুল হকের জন্ম
০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ ❖ ধ্রুপদী গায়ক পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম
০৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ❖ ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ ❖ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ ❖ কমলকুমার মজুমদারের মৃত্যু
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ❖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ❖ সৈয়দ মুজতবা আলীর মৃত্যু
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ ❖ সরোজিনী নাইডুর জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ ❖ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ❖ দাদাসাহেব ফালকের মৃত্যু
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ❖ জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ ❖ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ❖ সাগরময় ঘোষের মৃত্যু
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ❖ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ ❖ মৌলানা আজাদের মৃত্যু
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ❖ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ ❖ লীলা মজুমদারের জন্ম
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ ❖ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের জন্ম

ছোটগল্প

যে আমার সে কি আমার?

শেলী সেনগুপ্তা

তিতির ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে এসে আঁচল টেনে ধরে বলছে, 'মা ঝাপুর ঝুপুর কাকু এসেছে'। তিতির মেধার একমাত্র সন্তান। রাজন তিতিরের 'ঝাপুর ঝুপুর কাকু'।
রাজন আর মেধা একই অফিসে কাজ করে,দুজনেই চাকরি করে বেতারে। পিএসসির মাধ্যমে ওদের দুজনের চাকরি হয়েছে। মেধার পরের ব্যাচে রাজন কাজে যোগ দিয়েছে।
একই অফিসে কাজের সূত্রে দুজনের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল।

আজকাল কবিতা লিখে রাজন খুব প্রশংসা পাচ্ছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন পত্রিকায় ওর কবিতা প্রকাশ হয়। নতুন কবিতা লিখলেই মেধাকে পড়ে শোনায় আর মতামত জানতে চায়। মেধাও রাজনের কবিতা খুব পছন্দ করে। যখন সে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য নিয়ে বেশ গল্প হয়।

মেধাও লেখে। মেধা লেখে গল্প। তবে সে একটু অন্তর্মুখী। তাই রাজনের কাছে তা কখনোই প্রকাশ করা হয়নি। একবার যে সংখ্যায় রাজনের কবিতা ছাপা হয়েছে সে সংখ্যায়ই মেধার গল্প ছাপা হয়েছে। মেধাকে নিজের কবিতা পড়ে শুনিয়ে পত্রিকাটা ভাঁজ করে রাখতে গিয়েই মেধার নাম দেখে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিখ্যাত দৈনিকের সাহিত্যের পাতায় মেধার গল্প প্রকাশ হয়েছে। গল্পের নাম 'জানালার বাইরের জীবন'।

রাজন একবার পত্রিকার দিকে দেখে আর একবার মেধার দিকে দেখে। সে একই সঙ্গে অবাক এবং আনন্দিত। ওর কাণ্ড দেখে মেধার খুব হাসি পাচ্ছে। অনেক কষ্টে হাসি সামলাচ্ছে।

সেদিন থেকে মেধা রাজনের আরো পছন্দের মানুষ হয়ে গেল। মেধার লেখালিখির তদারক করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল। প্রায় অভিভাবকের ভূমিকায় গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে দিত। লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করত। মেধা একটা দূরত্ব রেখে চলছিল কিন্তু রাজন যেন সচেতনভাবে এই দূরত্বের বাঁধ ভাঙায় সচেষ্ট থাকত।

মাঝেমাঝে মেধার মেজাজ গরম হত কিন্তু রাজনের মধ্যে এমন একটা সারল্য থাকত রেগে উঠতে গিয়েও পারত না, শেষ পর্যন্ত নিজেই হেসে ফেলত। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটা গল্প চাইত রাজন। যেন এটা মেধার রুটিন কাজ। আগে অনেক সময় নিয়ে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে লিখত কিন্তু এখন রাজনের জন্য অনেক বেশি বেশি লিখতে হচ্ছে। তা বিভিন্ন পত্রিকাতে ছাপা হচ্ছে আবার প্রশংসিতও হচ্ছে।

মেধার বই প্রকাশ করার জন্য রাজন প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। আজকাল ওর একটাই কাজ মেধাকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা করা।

'ম্যাজিক লণ্ঠন' নামে সাহিত্যসেবীদের মাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠানে মেধাকে স্বরচিত গল্প পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। আমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে বুঝে গেল এটা রাজনের কাজ। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই সে সুড়সুড় করে রুম থেকে বের হয়ে গেল।

মেধার স্বামী প্রলয় ইঞ্জিনিয়ার ছিল। বিয়ের আট মাস পরেই প্রলয় মারা যায়। লাং ক্যান্সার ধরা পরার পর দু'মাস বেঁচে ছিল। এ দু'মাস মেধার দুঃস্বপ্নের কাল।

চিকিৎসা করতে গিয়ে জমানো সব টাকা আর মেধার সব মনোবল চলে গেছে। সবকিছু শেষ করে একসময় প্রলয়ও চলে গেল। প্রলয় মারা যাবার সাত মাস পর জানা গেল সে আগে একটা বিয়ে করেছিল, স্বামী-স্ত্রীর

সাতদিন ছুটি কাটিয়ে মেধা অফিসে এল। হাত ভর্তি রংধনু রঙের কাচের চুড়ি আর কপালে সূর্যের মত বড় টিপ উধাও। পরনে বিষণ্ন সাদা শাড়ি। মেধা এখন শুধু তিতিরের মা আর প্রলয়ের বিধবা স্ত্রী।

মধ্যে কোন একটা কারণে বনিবনা না হওয়াতে প্রলয়ের স্ত্রী এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার পরে জানতে পারে সে মা হতে চলেছে। তাদের ছেলে তিতিরের জন্ম হল। কিন্তু দু'জনের সম্পর্ক আর স্থাপিত হল না। তারও কিছুদিন পর প্রলয় আর মেধার বিয়ে হয়। দু'জনের জীবন ভাল কাটছিল। খুব ভালবাসত মেধাকে। প্রলয় ছিল খুব সহযোগী মানসিকতার। হয়তো আগের সংসার টেকেনি বলে সে মেধার প্রতি যত্নশীল বেশি, এটাও হতে পারে। অসুস্থ থাকার সময় শুধু বলত, 'মেধা, আমার জন্য তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল'। মেধা সান্ত্বনা দিত। দুজনের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রলয়ের মৃত্যু যখন ওর সব মনোবল কেড়ে নিয়েছে ঠিক তখনই তিতিরের মা তিতিরকে মেধার শাশুড়ীর কাছে দিয়ে গিয়েছিল। সে চলে গেল আমেরিকাপ্রবাসী এক বাঙালিকে বিয়ে করে। তখন থেকে তিতির হয়ে গেল মেধার সন্তান আর মেধা হল তিতিরের মা বাবা দু'জন।

অনেকদিন পর্যন্ত একা একা তিতিরের বাবামার দায়িত্ব পালন, বৃদ্ধা শাশুড়ির দেখাশুনা আর সংসার সামলে মেধা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই রাজনের আগমন। মেধার জীবনে একটা দোলা দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কেমন যেন একটা সংকোচ ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

আজকাল মেধা চেষ্টা করে রাজনের কাছ থেকে দূরে থাকার। অনেক চেষ্টা করেও তা সম্ভব হচ্ছে না। যখনই কোন সমস্যা হয় তা পারিবারিক বা অন্য কিছু তখনই সমাধানের জন্য রাজনের কথা মনে হয়। আর কেমন করে যেন সে-ও এসে হাজির হয়ে যায়।

তিতির হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল। রাজন এসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, স্কুলে ভর্তি হবার ফর্ম আনা এসব যেন রাজনের কাজ।

সব বন্ধুরা যখন বাবার গল্প করে তিতির তখন ওর ঝাপুর ঝুপুর কাকুর গল্প করে। মা বকলে তিতির অপেক্ষা করে তখন ওর ঝাপুর ঝুপুর কাকু আসবে আর ও মার নামে নালিশ করবে। ডাক্তারের কাছে যেতে তিতিরের খুব ভয়। গল্প বলে কবিতা শুনিয়ে ওকে ডাক্তারের কাছে নিতে হয়। একটা কবিতা ওর খুব পছন্দ– সেখান থেকে ঝাপুর ঝুপুর শব্দটা পেয়েছে তিতির। সেই থেকে রাজন ওর ঝাপুর ঝুপুর কাকু, ডাকটা রাজনও খুব উপভোগ করে। তিতির এবং রাজনের মধ্যে চমৎকার একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক, যেটা মেধার ভাল লাগছিল।

মেধার শাশুড়ীর খুব অসুখ। অনেক রাতে বুকে ব্যথা। হাসপাতালে নেওয়া দরকার। মেধার মনে হল রাজন ছাড়া আর কে ওকে সাহায্য করবে। ঠিক তখনই মোবাইল বেজে উঠল। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে রাজনের সবসময়ের মত ফুর্তির স্বর শোনা গেল 'হাই, নোবেল বিজয়ী'। আজকাল রাজন ওকে নোবেল বিজয়ী বলে ডাকে। ওর কথার জবাব না দিয়ে শুধু বলল, তুমি কোথায়? গলার আওয়াজে যেন কী ছিল, রাজন কোন কথা না বলে ফোন কেটে দিল, দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির। একাই মেধার শাশুড়ীকে দোতলা থেকে নামিয়ে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন। তিনদিন পর্যন্ত সে হাসপাতালে থেকে ওনার দেখাশুনা থেকে শুরু করে মেধার পরিবারের জন্য যা যা দরকার সবই করেছে। তিনি সুস্থ হয়ে হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফিরে রাজনকে নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করলেন।

রাজন প্রায় প্রতিদিন আসে মেধার শাশুড়ীকে দেখতে। এসেই প্রথমে ওঁর রুমে ঢুকে কিছুক্ষণ গল্প করে, তারপর মেধার সঙ্গে কথা বলে। তিতির সারাক্ষণ রাজনের গলায় ঝুলে থাকে। যার সঙ্গে যত কথা বলুক কিন্তু তিতিরের কথার জবাব আগে দিতে হবে।

মেধা আর রাজন যেন আরো কাছাকাছি চলে এল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেধার সঙ্গে গল্প করে। আজকাল যেন নিজের অজান্তেই ও রাজনের জন্য অপেক্ষা করে। মনে আনন্দের ভাব, সব কিছুই ভাল লাগে। মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গায়।

এদিকে দিন দিন মেধার শাশুড়ীর দৃষ্টি যেন বদলে যাচ্ছে। এখন তিনি আর রাজনকে আগের মত পছন্দ করেন না, আগের মত কথা বলেন না। সে এসেই কিছুক্ষণ ওঁর কাছে বসে খোঁজখবর নিয়ে মেধার সঙ্গে গল্প করে তিতিরকে আদর করে একসময় ফিরে যায়।

আজও সে এল, কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। রাজন খুব মন খারাপ করল কিন্তু বুঝতে না দিয়ে মেধা আর তিতিরের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বিষয়টা মেধারও ভাল লাগল না। হঠাৎ ওর কী হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে পেছন থেকে রাজনকে হেঁচকা টান দিয়ে নিজের দিকে ফিরিয়ে বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজন ওকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে চুলের মুখ গুঁজে দিল। ওর ঘাড়ের মধ্যে নাক ঘষতে ঘষতে সামনে দিকে চোখ পড়তেই ছিটকে সরে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তিতির ওদের দেখছে। তিতিরের পেছনে ওর দিদা, মেধার শাশুড়ী, দু'চোখ থেকে ঘৃণা আর রাগ ঠিকরে পড়ছে।

মুহূর্তেই মেধা ছিন্ন লতার মত মাটিতে পড়ে গেল আর রাজন দরজা দিয়ে বের হয়ে চলে গেল।

সাতদিন ছুটি কাটিয়ে মেধা অফিসে এল। হাত ভর্তি রংধনু রঙের কাচের চুড়ি আর কপালে সূর্যের মত বড় টিপ উধাও। পরনে বিষণ্ন সাদা শাড়ি। মেধা এখন শুধু তিতিরের মা আর প্রলয়ের বিধবা স্ত্রী।

শেলী সেনগুপ্তা
কবি, গল্পকার

প্রবন্ধ

হীরক রাজার দেশে

সত্যজিতের রাজা এমন কেন?

বিধান রিব

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী– সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবী রূপে।
– কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

অগ্রগামী সিনেমাপ্রেমীমাত্রই জানেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দুই চরিত্র গুপীগাইন ও বাঘাবাইনকে নিয়ে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ১৯৬৮ সালে। এরপর এই দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হীরক রাজার দেশে ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৮০ সালে। দু'টি ছবিরই পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনা উপেন্দ্রকিশোরের নাতি সত্যজিৎ রায়ের। বাড়তি খবর হল হীরক রাজার দেশে ছবির কাহিনিও তাঁর রচিত। আমরা এই প্রবন্ধে রায়ের হীরক রাজা ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করব। ছবির কাহিনি সকলেই কমবেশি জানেন, তাই সেই বিশদে না গিয়ে সরাসরি আলোচনায় ঢুকতে চাই।

এই ছবিতে মূলত আমরা তিনটি পক্ষ দেখি। একটি হল হীরক রাজা ও তার লোকজন, দ্বিতীয় পক্ষ হল উদয়ন পণ্ডিত, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক। আর তৃতীয় পক্ষটি হল বিদেশী শক্তি অর্থাৎ গুপী ও বাঘা। দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতায় প্রথম পক্ষের বিপক্ষে জয় লাভ করার গল্প এটি। রাজনৈতিক ভাষ্যে বললে শোষিতদের সঙ্গে শাসকের সংঘাতের গল্পই বলেছেন সত্যজিৎ। এই গল্পের তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করে সামনে বাড়তে চাই। একটি হল 'যন্তরমন্তর' বলে যে যন্ত্রটি রয়েছে সেটি, আরেকটি হল হীরকের রাজ্যে মানুষের মুখের ভাষা এবং তিন নম্বর বিষয়টি হল চরিত্রদের নামকরণ।

এক.

হীরক রাজার মগজ ধোলাই যন্ত্র যন্তরমন্তরে বিরোধী পক্ষের লোকজনদের ঢুকিয়ে মগজ ধোলাই করা হত। এই মগজ ধোলাই করা মন্ত্রগুলো বেশ মজার। কৃষকদের জন্য মন্ত্রগুলো হল: 'বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না', 'ভরপেট নাও খাই, রাজকর দেয়া চাই', 'যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান'। খনি থেকে যারা রাজার জন্য হীরা সংগ্রহ করত সেই খনিমজুরদের জন্য মন্ত্রগুলো হল: 'যে করে খনিতে শ্রম, যেন তারে ডরে যম', 'অনাহারে নাহি খেদ, বেশি খেলে বাড়ে মেদ', 'ধন্য শ্রমিকের দান, হীরকের রাজা ভগবান'। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য মন্ত্রগুলো এমন: 'লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে', 'জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই'।

রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণার প্রয়োজন হয় বলেই মন্ত্রীরা থাকেন। মন্ত্রী তথা শাসকগোষ্ঠী এই মন্ত্রণা জনগণের কাছে পৌঁছয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। এই গণমাধ্যমই অধুনার যন্তরমন্তর যন্ত্র। এটি দিয়েই মানুষের মগজ ধোলাইয়ের কাজ চলে। সাম্রাজ্যবাদীরাও এই যন্ত্র ব্যবহার করে, বৃহত্তর অঞ্চল শাসনের অভিলাষে। শাসনকার্য পরিচালনায় টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র ব্যবহারের নমুনা ফ্যাসিবাদী সকল সরকারের আমলেই দেখা যায়। অনুন্নত বিশ্ব থেকে উন্নত বিশ্ব, যেসব দেশে গণতন্ত্রের ধ্বজা ওড়ে এবং যেসব দেশে ওড়ে না, সকল দেশেই মিডিয়াকে প্রপাগান্ডা মেশিন হিসেবে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী। তারা এমনভাবে এই যন্ত্রকে ব্যবহার করে যাতে মনে হয় জনগণের স্বার্থে নানা সংস্কার কাজ চলছে পুরোদমে, বর্তমান সরকার ছাড়া এই কাজ কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল না। অথচ অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনার ব্যাপারে তারা থাকবে নীরব। বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে। যেমন সাধারণ মানুষের সঙ্গে জমির মালিকানা সম্পর্ক নিয়ে বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠী কখনই কোন কথা বলবে না। ধনতন্ত্রে একজনেরই একরের পর একর জমি থাকবে, অথচ হাজারো মানুষ থাকবে ভূমিহীন সর্বহারা।

জার্মান তাত্ত্বিক বাল্টার বেনিয়ামিন যেমনটা বলেন, সর্বহারা মানুষ যেখানে ভূমির বন্টন ও ভূমির উপর তাদের অধিকার পাল্টে দেয়ার জন্য উদগ্রীব সেখানে ফ্যাসিবাদী সরকার অন্য সবকিছুই করবে এই কাজটি ছাড়া। আর এই কাজটি তারা সম্পন্ন করে খুব সুচারুভাবে। রাজনীতিকে নান্দনিকতার মোড়কে হাজির করে তারা, সর্বহারা সাধারণ মানুষের অধিকার জানানোর সুযোগ করে দেয় তারা, গণতন্ত্রের কথা বলে! কিন্তু সেই জনগণের অধিকার মেনে নিতেই তাদের যত কষ্ট। তাই তো হীরকের রাজা বলে, তার রাজ্যে শূলে চড়ানো নেই, গর্দান নেয়া হয় না, যা আছে তা হল মগজ ধোলাই। এখন যেমনটা হয়– আপনি অধিকারের কথা বলতে পারছেন, এটাই আপনার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি, কিন্তু অধিকার আদায় যে হচ্ছে না সেটা আপনাকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে গণমাধ্যমের নানামুখী ভূমিকার মাধ্যমে। অবশ্য এই মুহূর্তে অধিকারের কথাটাও বোধহয় বলা যাচ্ছে না। ফ্যাসিবাদ নিজেই যে নিজের কবর খোড়ে সেই খবর প্রতিবারই ভুলে যায় ফ্যাসিবাদী সরকার।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলছেন, "নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তি-সম্পর্কসহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ ভেলকিবাজির মত উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মত যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।" পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন উপায়ে উন্নতির পথ বেয়ে উপরে ওঠে যাতে দিনকে দিন কিছু মানুষ ধনী থেকে আরো ধনী হয়, আর অধিকাংশ মানুষ গরীব থেকে আরো গরীব হয়। একারণেই পশ্চিমা দেশে 'আমরা ৯৯ ভাগ' আন্দোলন হয়। হুমকির মুখে পড়ে বুর্জোয়া শাসক ও এলিটরা। বুর্জোয়াদের ভোজবাজির অর্থনীতির সাক্ষ্য দেয় পানামা দলিল কেলেঙ্কারি। সেসব দলিলে দেখা যায় বিশ্বের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান, তাদের পরিবারের সদস্য ও এলিটদের অর্থের অবৈধ পাহাড় গড়ে উঠেছে দিনের পর দিন, আর অন্যদিকে কিছু মানুষ শুধু শোষিতই হয়েছে। শোষিত শ্রেণীই কর পরিশোধ করে ষোল আনা, অপরদিকে নীতিকথা আওড়ানো শাসক ও এলিটরাই কর ফাঁকি দিতে সবচেয়ে বেশি ঝানু। পানামা দলিল তো সেই কথাই বলছে! অথচ তাদের মুখেই শুনবেন 'বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না'।

ধনতন্ত্রে সাধারণ মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়, যন্ত্র হয়ে তারা মালিকের পুঁজিকে আরো শক্তিশালী করে, স্ফীত করে সঞ্চয়। হীরক রাজাও তেমনি ক্ষমতা গ্রহণের পর হীরার লোভে মানুষগুলোকে বানিয়ে ফেলে যন্ত্র। আমৃত্যু যেন রাজার এই খনিতেই কাজ করে যায় সেজন্য শ্রমিককে শেখানো হয় মন্ত্র– 'যে করে খনিতে শ্রম, যেন তারে ডরে যম'। একই কায়দায় কৃষকও শোষিত হীরকের রাজ্যে, আমাদের রাজ্যে, আমাদের দুনিয়ায়। কৃষকদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়– 'যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান'। এশিয়ায় প্রতি বছর নানাবিধ সঙ্কটের কারণে যে পরিমাণ কৃষক আত্মহত্যা করে সে পরিমাণ মানুষ লিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রাণ হারায় না। আর ভিটা জমি কেড়ে নেওয়া, ফসলি জমিন অধিগ্রহণ করে তথাকথিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানানোর পাঁয়তারা তো আছেই।

এসব নিয়ে কৃষক যে আন্দোলন করছে না তা কিন্তু নয়। তবে ওই যে বেনিয়ামিন যেমনটা বলেছেন, ফ্যাসিবাদী সরকার এই আন্দোলন করতে দেবে ঠিকই, আমলে নেবে না। আমলে নেবে মুনাফাকে। নিজের মুনাফাই তাদের কাছে মূখ্য বিষয়। আর এই উদ্দেশ্য সাধনে তারা রাজনীতিকে মুড়ে দেবে নান্দনিকতার মোড়কে। একারণেই কি হীরকের রাজা ও চেলাচামুণ্ডারা ছন্দে ছন্দে কথা বলে? উদয়ন পণ্ডিত বা সাধারণ মানুষ, এমনকি রাজ প্রাসাদ থেকে বেরুনোর পর গুপী বা বাঘা, কেউই ছন্দবদ্ধ ভাষায় কথা বলে না? তাদের মুখের ভাষা আমরা দেখি কৃত্রিম নয়। এলিটদের ভাষা তারা ধারণ করে না। এটা যেন অনেকটা দেশীয় এলিটদের ইংরেজি প্রীতির মত। সাধারণের মুখের যে বাংলা, সেটা শাসকগোষ্ঠীর মুখে শোভা পায় না। তারা বাংলা বলতে লজ্জা পান। দেখবেন তারা এই ইংরেজিকে সম্বল করে শাসনকার্য পরিচালনা করে, সাধারণের উপর ছড়ি ঘুরায়। আবার একুশে ফেব্রুয়ারি বা বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ এলে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতেই আয়োজনের ধুম লেগে যায়। অথচ যে দেশে একুশে ফেব্রুয়ারির মত ঘটনা ঘটে, সেই দেশে যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল থাকা ভাষাশহীদ ও ওই আন্দোলনের প্রতি বেঈমানি, সেটা তারা ভুলে যায়। এটা অনেকটা ফ্যাসিবাদী আচরণই– একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করবেন কিন্তু তার চেতনাকে ধারণ করবেন না।

হীরক রাজাও দেখবেন শ্রমিকদের কষ্টের কথা স্বীকার করে, যখন গুপী ও বাঘা খনি পরিদর্শনে যায়। শ্রমিকদের কষ্ট হয় সেটা রাজা স্বীকার করছেন, বলছেন– 'ছিঃ, মজুরদের হেয়জ্ঞান কোরো না, কাজ তো করে ওরাই!' কিন্তু এই কষ্ট তৈরির কারিগর রাজা নিজেই, তিনিই এই কষ্ট জারি রাখার সকল আয়োজন করেন, নিজের মুনাফার জন্য। নিজের স্বার্থ, স্তুতি ও প্রচারের জন্য রাজা পোষেন বুদ্ধিজীবী বিদূষককে, কবিকে, বিজ্ঞানীকে, পুরোহিতকে। হীরার লোভে এরা রাজার দাসে পরিণত হন। মার্কস-এঙ্গেলস যেমনটা বলেছিলেন, বুর্জোয়া শ্রেণী অনেক সম্মানজনক বৃত্তির মানুষকে পরিণত করেছে মজুরি-ভোগী শ্রমজীবীতে, সমাজে তাদের মাহাত্ম্য আর নেই। হীরকের রাজ্যে মন্ত্রীরাও 'ঠিক ঠিক ঠিক' ছাড়া আর কোন কথা বলেন না। হীরকের রাজ্যের মতই আজকাল অনেক পেশাই আর মহৎ নেই। সে চিকিৎসা বলুন অথবা শিক্ষকতা। হীরক রাজ্যে যদিও উদয়ন পণ্ডিত একজন শিক্ষক এবং তার নেতৃত্বেই বিপ্লব সংগঠিত হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী* নাটকের অধ্যাপক?

'রক্তকরবী'র তুলনা টানলাম কারণ ওই নাটকেও একই রকম কাহিনি লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও যক্ষপুরীতে সোনা উত্তোলনের কাজ করে শ্রমিকরা। সেখানেও মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথের

যন্তরমন্তর যন্ত্র হল একটি মন্দির ও আরেকটি মদের দোকান। এগুলো হল সম্মতি আদায়ের কৌশল। বলপ্রয়োগের জন্য মদের ভাড়ার ও মন্দিরের সঙ্গে অস্ত্রশালা আছে। ইতালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি যেমনটা বলেছেন– শাসন করতে হলে বলপ্রয়োগ ও সম্মতি– দুটোকেই চাই। সম্মতি আদায় আসলে মগজ ধোলাইয়ের নামান্তর মাত্র। *রক্তকরবী* ও *হীরক রাজার দেশে* এই মগজ ধোলাইয়ে বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। *রক্তকরবী*র মত রায়ের ছবিতেও মাথা বিকিয়ে দেয়া বুদ্ধিজীবী, পুরোহিত, মন্ত্রীদের চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ আর রায়ে পার্থক্য বলতে শুদ্ধ নারী ও পুরুষে। মানে রবীন্দ্রনাথের কাণ্ডারি হল একজন নারী– নন্দিনী। আর রায়ের হল উদয়ন পণ্ডিত। একটি বিষয় বেশ বিস্ময়কর, সেটি হল, রায়ের এই ছবিতে কোন নারী চরিত্র নেই, একমাত্র যখন হীরকের রাজা ঠেঙিয়ে সব বস্তিবাসীকে একটি ঘেরটোপে পুরছিলেন, মানে বল প্রয়োগ করছিলেন, তখন কিছু নারীকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। রাজ্যে বিদেশী অতিথিরা আসবেন তারা গরীবিয়ানা দেখে ফেললে চলবে কি করে? তাই তো সত্যজিৎ এখানে বৌদ্ধিক সম্পাদনা ওরফে ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজে দেখালেন খাঁচার মধ্যে আটকে পড়া কিছু জন্তুকে। আমাদের দেশে শাহবাগের সামনে পাঁচ তারকা হোটেলের সামনে যে ভিক্ষুক নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সেটার সঙ্গে এর খুব বেশি পার্থক্য নেই। এটাও ফ্যাসিবাদী আচরণ– জোর করে বাস্তবকে আড়াল করার চেষ্টা। তো রায়ের ছবিতে কেন নারী চরিত্র নেই, এই প্রশ্ন এখানে ধাঁধা আকারেই থাকুক। আমরা আলোচ্য বিষয়েই থাকি।

যুগে যুগে শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র একই রকম। তাদের আলাদা করে কোন পরিচয়ের দরকার নেই। সেই কারণেই কি রায়ের শাসকগোষ্ঠীর কোন নামগন্ধ নেই? লক্ষ্য করবেন রাজা, মন্ত্রী, বিজ্ঞানী, কবি, পুরোহিত, বিদূষক কারো নামই এখানে উচ্চারিত হয় না। উল্টোদিকে দেখবেন উদয়ন পণ্ডিতের যেমন নাম আছে, তেমনি তার প্রত্যেক ছাত্রের নামও আলাদা করে উচ্চারণ করতে দেখা যায় ছবিতে। রায়ের রায় কি তবে এই-বিপবীদের নাম হয়, শাসক ও শোষকদের নয়? রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকেও কিন্তু একইভাবে আমরা দেখি নন্দিনী, রঞ্জন, বিশু এই সাধারণের বিপরীতে রাজা, অধ্যাপক, সর্দার, মোড়ল এদের কোন নাম নেই। শাসকদের একটাই পরিচয়– তারা 'ভগবান'। তো এই 'ভগবান' সর্বক্ষণই বলতে থাকে– 'ভরপেট নাও খাই, রাজকর দেওয়া চাই', সেই রাজকর যায় কোথায়? উত্তরে হয়তো বলবেন, কখনো এই কর যায় উন্নয়নের নামে শাসকদের জেবে, কখনো বা ঋণের নামে এলিটদের পেটে, আবার কখনো বা ফিলিপিন বা অন্য কোন দেশের জুয়ার টেবিলে। এই রাজকর দেশের জনগণের হিতার্থে কতটুকু ব্যবহার হয়? সেটার জবাবদিহিতাও তো নেই!

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়, কিন্তু শিক্ষা খাতে বাজেটে কতটুকু বরাদ্দ দেওয়া হয়? ছাত্রদের শিক্ষা কেন পণ্যের মত বাজার থেকে কিনে নিতে হয়? কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা বন্ধ হয়ে যায়? এটাও শাসকদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র। এই দৃশ্যই আমরা রূপক আকারে দেখি হীরক রাজার দেশে, সেখানে শেখানো হয়– 'জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই'। শিক্ষাকে কেন ভয় পান হীরকের রাজা? কারণ শিক্ষা থাকলে উদয়ন পণ্ডিতের মত মানুষের উদয় হয় এবং তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। এতে বাধাগ্রস্ত হয় হীরক উত্তোলন ও নিজের আরাম-আয়েশ। তাই তো রাজা বলেন– 'যে যত বেশি শেখে, তত বেশি জানে, সে তত কম মানে', একই কারণে ফ্যাসিস্ট এই রাজা পুড়িয়ে দেয় বইপুস্তক। হীরক রাজার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুর্জোয়া শাসকদের থেকে অভিন্ন নয়। এজন্যই দেখবেন বাইরে থেকে বই আমদানির ক্ষেত্রে বা কাগজ কেনার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কর বসিয়ে রাখা হয়েছে।

দুই.

'অনাচার করো যদি, রাজা তবে ছাড়ো গদি/ যারা তার ধামাধারী, তাদেরও বিপদ ভারি/ করিবে শোষণ পাপ, ক্ষমা চেয়ে নাহি মাপ/ নাহি কোন পরিত্রাণ, হীরকের রাজা শয়তান।' এমন সংলাপ উদয়ন পণ্ডিতের মুখে শোনা যায় ছবির শেষাংশে। এখানে পণ্ডিত ধারণ করেছেন সেই ছন্দবদ্ধ ভাষা, যা এতদিন ছিল রাজার ভাষা। রাজার ভাষা দিয়েই রাজাকে ছবক শেখানোর এই পন্থা নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলে ইংরেজ হটানোর জন্য অনেকেই মনে করতেন ইংরেজি শেখাটা জরুরি। তাই পণ্ডিতও রাজার ভাষাতেই রাজাকে উল্টো শিক্ষা দেন। এক রক্তপাতহীন সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিদায় নিতে হয় রাজাকে। সকলে ময়দানে গিয়ে রাজার মূর্তিকে মাটিতে ফেলে দেয়। এসময় স্লোগান শোনা যায়– 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান'। মজার বিষয় রাজার তৈরি করা যন্তরমন্তরে রাজার মগজই ধোলাই করা হয়, এরপর রাজাও এসে একই স্লোগান দেয় আর দড়ি ধরে নিজের মূর্তি মাটিতে নামিয়ে আনে।

কিন্তু শাসক কি কখনো শাসিতদের কাতারে নিজেকে আবিষ্কার করে? এখানেও সত্যজিৎ অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী*তে দেখা যায় ফাগুলাল যখন রাজাকে বলছে, 'কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝনি তো? আমরা তোমারই বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।' তখন রাজা প্রত্যুত্তরে বলে, 'হ্যাঁ আমারই বন্দীশালা। তোমাতে-আমাতে দু'জনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।' এই নাটকে সৃষ্ট যে অন্ধকার বন্দীশালা বা জগৎ বা যন্ত্রসভ্যতা বা পুঁজিবাদ– যাই বলি না কেন সেটা ভাঙার কাজে রাজাও হাত লাগাচ্ছে, অথচ এই রাজাই এই জগত তৈরি করেছিল ও আগলে রেখেছিল। এই রাজা নিজের শ্রেণী অবস্থান ভুলেছে নন্দিনীর প্রেমে, আর হীরকের রাজা নিজের শাসক চরিত্র ভুলেছে যন্তরমন্তরের গুণে। তো ইতিহাসে কি এই রকম ঘটনা ঘটা সম্ভব? এটা ঠিক বিপ্লব নানাভাবেই সম্পন্ন হতে পারে– রক্তাক্ত বিপ্লব বা রক্তপাতহীন বিপ্লব- হীরকের রাজ্যে রক্তপাতের দরকার হয়নি, হীরার লোভেই সৈন্যরা কাত হয়ে যায়। তো এই 'ঘুষের বিপ্লব' না হয় মানা গেল, কিন্তু ঠাকুর ও রায়ের দুই রাজা এমনটি কেন করতে গেলেন?

চলচ্চিত্র আলোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাত দিয়ে আরেক চলচ্চিত্র সমালোচক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, রায়ের এই বিপ্লব হল 'লিবারেল হিউম্যানিস্টের বিপ্লব'। ঠাকুরের ঐ বিপ্লবও একই গোত্রের– 'উদার মানবতাবাদী বিপ্লব'। তাঁদের এই উদারতার উৎস আধুনিককালের উদারনীতি বা Liberalism, এই উদারনীতি বলতে একসময় মানে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিধিব্যবস্থাকে সমর্থন, সর্বজনীন রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি বুঝালেও আধুনিক সময়ে এতে যোগ হয়েছে সংস্কারবাদী মনোভাব। সামন্তবাদকে উচ্ছেদের জন্য একসময় পুঁজিবাদ নিজে প্রগতিশীল আচরণ করলেও, নিজের পূর্ণবিকাশ পরবর্তী সঙ্কটে সে হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কারবাদী। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদারনৈতিকরা একদিকে যেমন জনগণের রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাস করে, আবার আরেক দিকে বিপ্লবেরও বিরোধিতা করে, সংস্কারেই তাদের অধিক আস্থা। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা মনে করে আইনি বৈধতা– সেটা যেভাবেই হোক না কেন– যদি কোন সরকারের থাকে তো সেই সরকারও বৈধ বলে পরিগণিত হবে। উদারনীতিতে সকলেই সমান, আইন সবার জন্য এক, প্রশাসন সবার জন্য অভিন্ন আচরণ করবে, কিন্তু বাস্তব কি এভাবে পরিচালিত হয়? সারা দুনিয়ায় তো বড়লোকদেরই আইন চলে, প্রশাসন দরিদ্রদের সঙ্গে নির্মম আচরণ করে। উদারনীতির উপরিভাগে তাই আপনি শুনতে পাবেন– 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে', মানে জনগণই ক্ষমতার মূল উৎস, আসলেই কি তাই?

এই উদারনীতির খপ্পরে পড়েই আমাদের ঠাকুর ও রায় জনগণের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এক কাতারে সামিল করে দেন খোদ শাসককে। শাসকও হয়ে ওঠে নিপীড়িত জনগণের সঙ্গী, তারাও হয়ে ওঠে বিপ্লবী! রোমান্টিক উদারনীতিতেই এটা কেবল সম্ভব। শাসকগোষ্ঠী চাইলেই শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদেরই পক্ষে বিপ্লব করতে পারে না, বিশেষ করে আবার যারা সরাসরি রাজ্য বা রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, প্রধান ব্যক্তি! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই। তাহলে ঠাকুর ও রায়ের সৃষ্টিতে কেন এমন নজির পাওয়া যায়? এর কারণ তাঁরা নিজেরা নিজেদের শ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তারপরও তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়, কারণ শেষের ঐ উদারতা বাদ দিলে এমন রূপক ও সংকেতধর্মী সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের জন্য নিঃসন্দেহে এক পরম পাওয়া বৈকি।

বিধান রিব
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুষ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ

ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুষ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই- মেইল করতে বলা হয়:

ক. ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
খ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
গ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭।

এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

নিবন্ধ

গান যখন ছবির প্রাণ

গাইড-এ শৈলেন্দ্র-শচীন ম্যাজিক

এমিলি জামান

চলচ্চিত্র জনপ্রিয় শিল্প-মাধ্যমগুলোর অন্যতম। একটি মানসম্মত ছায়াছবি জনমনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। যুক্তিনির্ভর কাহিনি, পরিচালকের শৈল্পিক সচেতনতা এবং অভিনয়-শিল্পীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার সঙ্গে যদি 'গান' এসে মেশে আর সে-গান যদি ছবির দৃশ্য ও বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে ছবির জন্যে গান নাকি গানের জন্যে ছবি, ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

কতিপয় কালোত্তীর্ণ ছবির নান্দনিক সাফল্যের রহস্য ছবিগুলোর গানে লুকিয়ে আছে। গানে প্রাণ পাওয়া কালজয়ী গুটিকয় ছবির একটি ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ষাটের দশকের অন্যতম দর্শনদীপ্ত ভারতীয় ছায়াছবি *গাইড*।

ছবির কাহিনিতে হতাশা-নিমজ্জিত নৃত্যপ্রতিভা রোজি ঈশ্বরের কৃপায় খুঁজে পেল গাইড রাজুকে। সে হয়ে উঠল তার সত্যিকারের শিল্পসঙ্গী। ছবিতে রাজু আক্ষরিক এবং প্রতীকী উভয় অর্থেই গাইড। নৃত্যশিল্পের সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দেবার অসামান্য সুযোগ রোজির ভাগ্যে জুটে গেল। পায়ে নতুন করে ঘুঙুর বাঁধার পর কণ্ঠে এসে ভর করল সুরের উন্মাদনা।

ছবিটির মানসম্পন্ন কাহিনি উপহার দিয়েছেন মার্কিন নোবেল-বিজয়ী লেখিকা *গুড আর্থখ্যাত* পার্ল এস বাক। ভারতীয় এক নৃত্যশিল্পীর জীবনালেখ্য *গাইড*-এর গল্পে তুলে ধরেছেন তিনি। হিন্দির পাশাপাশি *গাইড*-এর ইংরেজি ভার্শনও আলাদাভাবে নির্মিত হয়েছিল।

কী আছে *গাইড*-এর গানে?

আজকের 'ধর তক্তা মার পেরেক'-এর যুগে দাঁড়িয়ে হারানো দিনের স্মৃতি-রোমন্থন আর স্মৃতি-তর্পণই শুধু করা চলে। আগেকার দিনের দুর্ধর্ষ টিম-ওয়ার্ক এ-যুগে শুধুই কল্পনা। বাণিজ্য এখন অনেকটাই ক্রুড ফর্মে প্রদর্শিত। শিল্পের সুষমা-জড়ানো বেশভূষায় সে আর এখন সাজতে আগ্রহী হচ্ছে না। আগ্রহী হবেই বা কেন? 'তোকে দেখে গায় মন আমার রিমিক্স কাওয়ালি' জাতীয় পলকা লিরিকে ঠাঁসা চিৎকার-সর্বস্ব গান শুনে সোল্লাসে নর্তন-কুর্দন করার পাবলিকের তো অভাব নেই! আজকাল কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের দলে মধ্যবয়সীরাও নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ছেন। শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করতে ইদানীংকালে অনেকেই বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছেন। যাকগে, আশকথা-পাশকথা ছেড়ে *গাইড*-এর গান-প্রসঙ্গেই আলোকপাত করা যাক। *গাইড* নবকেতনের ছবি। এ ছবির গান লিখেছিলেন বিশিষ্ট গীতিকার শৈলেন্দ্র। নবকেতন ছিল সুদর্শন নায়ক দেবানন্দের পারিবারিক ফিল্ম প্রোডাকশন। চেতনানন্দ, বিজয়ানন্দ, দেবানন্দ– ত্রিমূর্তির কড়া নজরদারিতে নবকেতনের ফিল্মে গানের মান ছিল এককথায় যাকে বলা যায় 'ক্ল্যাসিক'। ছবির সংগীত পরিচালক এবং লিরিসিস্টের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনায় সময় ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না নবকেতন কর্তৃপক্ষ। *গাইড* ছায়াছবিতে প্রতিভাময়ী তারকা-অভিনয়শিল্পী ওয়াহিদা রেহমানের ঠোঁটে কণ্ঠসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের আজ অবধি শ্রোতাপ্রিয় 'আজ ফির জিনেকি তামান্না হ্যায়' গানটি প্রথমাবস্থায় অনুমোদন করলেন না নবকেতনের অন্যতম সদস্য ও ছবির নায়ক দেবানন্দ। বিদগ্ধ সংগীত ব্যক্তিত্ব ও সংগীত পরিচালক শচীনদেব বর্মণের নেতিবাচক মন্তব্যে পিছিয়ে গেলেন না। দেবকে ট্রায়াল রেকর্ডিং এবং ট্রায়াল শুটিংয়ের গ্রিন সিগন্যাল দিতে অনুরোধ জানালেন। দেব বর্ষীয়ান শচীনদেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তারপরের ইতিহাস তো ম্যাটিনি শোয়ের পরের। রসজ্ঞ গীত রচয়িতা শৈলেন্দ্র, প্রাজ্ঞ সুরশিল্পী শচীনদেব বর্মণ, কণ্ঠসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর আর ঋদ্ধ অভিনয়শিল্পী ওয়াহিদা রেহমান 'আজ ফির জিনেকি তামান্না'-য় যে প্রাণরস সৃজন করলেন, সেই প্রাণরসের অমৃতধারায় আজকের দিনের সংগীতপিপাসুরাও সিক্ত।

ছবির কাহিনিতে হতাশা-নিমজ্জিত নৃত্যপ্রতিভা রোজি ঈশ্বরের কৃপায় খুঁজে পেল গাইড রাজুকে। সে হয়ে উঠল তার সত্যিকারের শিল্পসঙ্গী। ছবিতে রাজু আক্ষরিক এবং প্রতীকী উভয় অর্থেই গাইড। নৃত্যশিল্পের সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দেবার অসামান্য সুযোগ রোজির ভাগ্যে জুটে গেল। পায়ে নতুন করে ঘুঙুর বাঁধার পর কণ্ঠে এসে ভর করল সুরের উন্মাদনা। আচমকা 'সব পেয়েছি'-র উন্মাদনা ছবির দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গানে এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এসেছে যে সুরশিল্পী এস ডি বর্মণ আর কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকর রসজ্ঞ শ্রোতার কাছে সহস্র-কোটিবার প্রশংসিত হবেন।

গাইড-এর টাইটেল সঙটি সংগীত পরিচালক বর্মণজীর স্বকণ্ঠে গীত। চলমান পথিকের জীবন-ভ্রমণের জীবন-দর্শন ঐ গানের কথা ও সুরে অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে। গানটি ছিল 'উঁহা কন হ্যা তেরা মুসাফির যায়েগা কাঁহা'। পথিক পথ চলতে চলতে ছোট ছোট বিরতি নেয় জিরিয়ে নেয়ার জন্য। গানের সুরে পথিকের সেই প্রবণতা অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সুরশিল্পী শচীনদেব বর্মণ।

গাইড-এ কণ্ঠসম্রাট মুহম্মদ রফির 'তেরে মেরে সপ্নে' তো সারাজীবন কানে লেগে থাকবার মত একটি গান। কিশোর-লতার দ্বৈতকণ্ঠে গীত 'গাতা র‍্যাহে মেরা দিল'-ও দুর্দান্ত!

মোটামুটি নয়টি গান *গাইড* ছবিতে দৃশ্যায়িত হয়েছে। কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে সংগীত পরিচালকের সমঝোতার বিবরণও *গাইড*-প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ছবির টাইটেল সঙটি শচীনজী প্রথমাবস্থায় মোহাম্মদ রফিকে দিয়ে গাওয়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনিং পর্বে যে অনবদ্য গায়নশৈলী শচীনজী মোহম্মদ রফির স্নায়ু ও কণ্ঠে গেঁথে দিতে চাইলেন, তার ওজন বুঝে বুদ্ধিদীপ্ত গায়ক রফি সহাস্যে সংগীত পরিচালককে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বললেন– 'শচীনজী, আপ গাইয়ে'। গুণী শচীনজী রফির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে স্বকণ্ঠে পারফর্ম করলেন 'উঁহা কন হ্যা তেরা'। *গাইড*-এর গান এভাবেই তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে।

পূর্ববাংলা ও রাজস্থানের লোকজ সুর অপূর্ব নান্দনিকতায় *গাইড*-এর 'আল্লাহ্ মেঘ দে পানি দে' এবং 'পিয়া তোসে ন্যায়না লাগে'-তে এসেছে। অন্যদিকে ক্ল্যাসিক্যালের দুর্ধর্ষতা এসেছে লতার অপূর্ব পারফর্ম্যান্স 'মু ছে ছল কিয়ে যা'-য়। বহুমাত্রিক শচীনের সৃজনশীলতা এককথায় অনন্য। লোকজ সুরের মায়াজালে জড়াতে জড়াতে স্বল্প বিরতির পর উচ্চাঙ্গ-সংগীতের আভিজাত্য তাঁর স্নায়ু দখল করেছে। *গাইড*-এর গানে সুর-গবেষক শচীন যাঁরা গান বোঝেন তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছেন। তবে, উল্লেখ করতেই হবে যে, *গাইড*-এর গানকে রংধনু রঙে সাজিয়েছে ছবির শিল্পরঞ্জিত দৃশ্যায়ন এবং অভিনয়শিল্পীদের আন্তরিকতা। নৃত্যসম্রাজ্ঞী ওয়াহিদা 'পিয়া তোসে' ঠোঁটে তুলে ছবির দৃশ্যে একই সঙ্গে নৃত্যশিল্পী ও সংগীতশিল্পীর মায়া সৃষ্টি করেছেন। ওয়াহিদা তাঁর 'কিয়া সে কিয়া হো গ্যায়া'-র ভাবনৃত্যে রফির অনবদ্য গানখানি দর্শকশ্রোতাদের মর্মে গেঁথে দিয়েছেন।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, শচীনদেব বর্মণ *গাইড*-এর গানের জন্যে যাঁদের সুবর্ণ-কণ্ঠের সহযোগিতা নিয়েছিলেন, তাঁদের সাংগীতিক পারঙ্গমতা প্রশ্নাতীত। তাঁরা প্রত্যেকেই জানতেন যে, অর্থ বুঝে না গাইলে গানে প্রাণ ফোটে না। ছবির শিল্পরঞ্জিত দৃশ্যে মোহাম্মদ রফির 'তেরে মেরে সপনে' দর্শক-শ্রোতার চোখে জল এনে দেয়। সুরের মাধুর্য ও বাণীর স্পষ্ট প্রক্ষেপণ 'তেরে মেরে সপনে'কে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে। রফি সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠেছেন পরিচালকের শিল্পী। *গাইড*-এর অপর দুই নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী লতা এবং কিশোরও সেটা-ই হয়ে উঠতে পেরেছেন।

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাতে হয় যে, পরিচালকের শিল্পী হয়ে ওঠার জন্য যে ধৈর্য ও সহনশীলতা আবশ্যক, এখনকার বাণিজ্য-দৌড়ের যুগে শিল্পীদের কাছ থেকে তা আর আশা করা যায় না। আজকাল আর রেঁধে মরতে হয় না, পোড়ালেই ঝোল হয়ে যাচ্ছে! ধন্যবাদ সুর-নির্মাতা শচীন! ধন্যবাদ গীত-স্রষ্টা শৈলেন্দ্র! ধন্যবাদ সুবর্ণকণ্ঠ লতা-রফি-কিশোর!

এমিলি জামান
সংগীতপিপাসু, শিল্পরসিক

কালীকচ্ছে অপূর্ব শেকড়-সন্ধান

হিমাদ্রিশেখর সরকার

মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে সে তত তার শৈশবের কাছে ফিরে যেতে চায়। হারানো শৈশবকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ পৃথিবীতে তুলনাহীন। এ তুলনাহীন আনন্দের সন্ধানলাভে বাংলাদেশের একটি গ্রামে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিলেন শতাধিক মানুষ। তারা এসেছিলেন তাদের জন্মভূমি কালীকচ্ছ গ্রামে। এটি একটি ইতিহাস-খ্যাত গ্রাম। গ্রামটির অবস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলা সদরের পাশে।

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সাত-আট বছরের বাচ্চাও এসেছিলেন এ মিলনমেলায়। বৃদ্ধ আর মাঝবয়সীরা জন্মভূমিতে এসেছিলেন তাদের সোনালি শৈশব আর কৈশোরের খোঁজে। ছোটরা এসেছিল তাদের পিতৃ পুরুষের ভিটেমাটি দর্শনে, যে গ্রামে জন্মেছিলেন তাদের বাপ-ঠাকুরদারা। ২০১৬-র ১ ও ২ ডিসেম্বর দু'দিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন কালীকচ্ছের দেশত্যাগী বাসিন্দারা তাদের আদিগ্রামে, তাদের পৈত্রিক ঠিকানায়। হয়েছিলেন আবেগে আপ্লুত আর আনন্দে আত্মহারা। পুরনো প্রতিবেশীদের কাছে পেয়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন আর আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কালীকচ্ছ, নোয়াগাঁও, সরাইল তথা পাশাপাশি প্রায় সব গ্রামের সব বয়সের মানুষ। অনেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন হারানো বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজনদের একনজর দেখার জন্যে। যারা এ প্রজন্মের তারাও এসেছে। পঞ্চাশ-ষাট কিংবা ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর সহপাঠী কিংবা প্রতিবেশীদের কাছে পেয়ে সবাই হয়েছেন স্মৃতিকাতর। মুক্তিযুদ্ধের আগে বা পরে যারা দেশত্যাগ করেছেন তারা হারানো শৈশবকে খুঁজেছেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, উচ্চ বিদ্যালয়ে (কালীকচ্ছ পাঠশালা), সরাইল মহাবিদ্যালয়ে অথবা গাঁয়ের মেঠোপথে। অনেকে জন্মভিটা খুঁজে পেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে আসামের করিমগঞ্জে চলে গিয়েছিলেন দয়াময় বর্ধন (৫০)। বাড়ি ছিল কালীকচ্ছের বারুজীবী পাড়ায়। চলে এসেছেন মাটির টানে। অনুতোষ চৌধুরী (৫৫) থাকেন ভূপেন হাজারিকার দেশ গৌহাটিতে (আসামের রাজধানী)। এখানে এসে খুঁজে পেয়েছেন পৈতৃক ভিটে। ভিন্ গাঁয়ের মানুষেরা এখন তাদের বাড়িতে থাকছেন। দাদু ছিলেন পাকিস্থান-আমলে কালীকচ্ছ ইউনিয়নের ডাকসাইটে প্রেসিডেন্ট দীনেশবন্ধু চৌধুরী। প্রায় ৭০ বছর আগে কলকাতায় চলে যাওয়া ড. সুনীল তলাপাত্র (৮৫) ইউজিসি অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। ফিরে এলেন মায়ের কোলে। সঙ্গে স্ত্রী কলকাতার মেয়ে অধ্যাপিকা ড. বাণী তলাপাত্র। বাণী এসেছেন শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর নেই, বাড়ি নেই, শ্বশুরের গ্রাম তো আছে! বাণী তলাপাত্র স্মৃতিচারণ করলেন এ গ্রামের অগ্নিযুগের বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে (১৮৮৫-১৯৬৫) নিয়ে। এই সেই উল্লাসকর যার তৈরি বোমা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসু ছুঁড়ে মেরেছিলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িতে। তিনি স্বচক্ষে উল্লাসকরকে কলকাতায় দেখেছেন দু'বার। এবার দেখে গেলেন উল্লাসকরের বাড়ির ভগ্ন দালানকোঠা– নির্মম ইতিহাসের সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসেছেন আসাম থেকে উল্লাসকরের উত্তরপুরুষ শংকরপ্রসাদ দত্ত (৫৬)। তাঁকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে খুশি পাশের বাড়ির দত্তপাড়ার রেখা বেগম। রেখার এখন স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। সেই সংসারে অতিথি হলেন শৈশবের প্রিয় শংকরদা। এভাবে অনেক পরিবারেই জায়গা হল আগত প্রতিবেশীদের অতিথি হিসেবে। মাত্র তো দুটো দিন, দুটো রাত।

এসেছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শংকরকুমার দেব। জন্ম এদেশে না হলেও বাপ-দাদার ভিটে এই কালীকচ্ছে। বিকাশ দেব (৫৩) এ গ্রামেরই বারুজীবী পাড়ার ছেলে। সুপরিচিত প্রয়াত দীনেশ দেব যার বাবা, আর এতদঞ্চলের নামকরা শিক্ষক প্রয়াত রঞ্জিত দেব ছিলেন তার

কাকা। তিনি এ কালীকচ্ছ সম্মিলনীর অন্যতম সংগঠক। এসেছেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় ডেপুটি স্পিকার পবিত্র কর-এর সঙ্গী হয়ে। ডেপুটি স্পিকার পবিত্র কর ও প্রাক্তন মন্ত্রী বিকাশ দেব জন্মসূত্রে একই পাড়ার লোক। পবিত্রবাবু গ্রামে এসে সবার সঙ্গে প্রতিবেশীর মতই মিশেছেন। খোঁজ নিয়েছেন কার খাওয়া হল আর কার না। থেকেছেন ঘরের ছেলের মত। ছবি উঠিয়েছেন যার-তার সঙ্গে যখন-তখন। এখানে তিনি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার নন, কালীকচ্ছের বারুজীবীপাড়ার ছেলে। তাঁর চালচলন, পোশাক-আশাক দেখে কারও বোঝার জো নেই যে তিনি ভারতের একটি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার। তিনি এ কালীকচ্ছ সম্মিলনীর অন্যতম প্রাণপুরুষ। আর এদিকে আছেন স্থানীয় সাংসদ মো. জিয়াউল হক মৃধা, যার উদ্যোগ-আন্তরিকতায় এতবড় কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছে।

ত্রিপুরা থেকে এসেছেন প্রবীর দাস। যিনি পাশের গ্রাম গলানিয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে। কোনদিন ভাবতে পারেননি এভাবে আবার জন্মের তীর্থভূমিকে দর্শন করতে পারবেন। এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে 'কালীকচ্ছ-সম্মিলনী'। ছোটখাটো চেহারার মন্দিরা নন্দী এ গ্রামের বিখ্যাত নন্দীবংশের সাধক ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ডা. মহেন্দ্র নন্দীর (১৮৫৪-১৯৩২) পৌত্রী। অধ্যাপিকা মন্দিরা এসেছেন আসামের করিমগঞ্জ থেকে। তিনি খুব সাধারণ পোশাকে সারাগ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখে অন্যেরা বুঝবে না তিনি এ গ্রামে বেড়াতে এসেছেন। শ্রীমতী নন্দী পিতৃপুরুষের মাটি আর মানুষের টানে আরও কয়েকবার এসেছেন এ গ্রামে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া 'কালীকচ্ছ-সম্মিলনী'র মূল প্রেরণা-সঞ্চারকদের একজন তিনি। তাঁকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন এ গ্রামেরই অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক শেখ মজলিশ ফুয়াদ করিমগঞ্জে গিয়ে।

কালীকচ্ছের দাতাদের একজন, যাদের বিশাল বাড়িতে একদা 'কালীকচ্ছ পাঠশালা' ও এখন 'বিজিবি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর' স্থাপিত সেই বাড়ির সন্তান শান্তিব্রত চক্রবর্তী (৭৫) আগাগোড়া উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। তিনি উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকও বটেন। সংগঠনের প্রাণপুরুষদের দু'জন আজ প্রয়াত। একজন কবি সুধীর দাস, আরেকজন ভারতীয় লোকসভার সদস্য অমিতাভ নন্দী। পাঠশালার আঙ্গিনায় স্থাপিত অনুষ্ঠানের মূলমঞ্চে প্রয়াত সংগঠকদের ছবি টানিয়ে তাদের কৃতিত্বকে স্মরণ করা হয়। সত্তরোর্ধ প্রাণোচ্ছল প্রভাতচন্দ্র সেনের কথা বলতেই হয়। তিনি ভারতের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন চিত্রশিল্পী। এ মাটির সন্তান। এসে খুঁজে ফিরছেন তার সোনালি শৈশব-কৈশোর আর যৌবন হাটে, মাঠে, ঘাটে– সর্বস্তরের মানুষের মাঝে।

'কালীকচ্ছ-সম্মিলনী'র মিলনমেলাটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল যখন উপমহাদেশ শুধু নয় সারা বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। পাশের উপজেলা নাসিরনগরে মাত্র একমাস আগে শত শত সংখ্যালঘুর বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে। নাসিরনগরের মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে কালীকচ্ছ গ্রামে এ অসাম্প্রদায়িক মিলনমেলা তাই গভীর তাৎপর্যবাহী। মেলা উদ্বোধন করতে এসেছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম হিরু, বীরপ্রতীক। অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে এসেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক মো. রেজওয়ানুর রহমান ও পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান। দু'দিনের অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাহিদা হাবিবা। কোন আমলাসুলভ মনোভাব তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।

এর আগে ২০১১ সালে 'তৃতীয় কালীকচ্ছ-সম্মিলনী' এ গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এবারের সম্মিলনীর গুরুত্ব আলাদা। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখেছে কালীকচ্ছ-সরাইল তথা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক বিপুল জনগোষ্ঠীর মানুষ কত অসাম্প্রদায়িক, কত বাঙালিয়ানায় উদ্বুদ্ধ! কালীকচ্ছ, নোয়াগাঁও, সূর্যকান্দি, ধর্মতীর্থসহ আশেপাশের গ্রামের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে এই অসাম্প্রদায়িক মিলনমেলায় কাঁধে-কাঁধ, বুকে-বুক মিলিয়ে কাজ করেছেন। পাশে থেকেছেন জনপ্রতিনিধি ও বয়স্করাও। বিশেষ করে যুবশ্রেণী আপ্যায়ন, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি সব দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করেছে। এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিরা করেছেন আর্থিক সহায়তা। এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল বাশারের নাম বলতেই হয়। কালীকচ্ছ বাজারের পশ্চিমপাশের বিশাল বাড়িটি তিনি তিনদিনের জন্য অতিথিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় থেকে যারা এসেছিলেন তারা শুধু বেড়াতেই আসেননি। তারা এদেশের মানুষের জন্য মৈত্রী আর সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন গানে-গানে, প্রাণে-প্রাণে। আর তা প্রচার করে গেলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তারা শোনালেন শচীন দেববর্মণের 'আমি তাকডুম তাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল' অথবা শাহ্ আবদুল করিমের 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম, বাংলার নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান, মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদী গাইতাম, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' গান। দু'দিনেই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার একদিন ছিল 'ভারত-সন্ধ্যা', আরেকদিন 'বাংলাদেশ-সন্ধ্যা'। ত্রিপুরার কৈলাশহর থেকে এসেছিলেন শিল্পী রাজা হাসান আর মোহাম্মদ কাইয়ুম। সঙ্গে ছিলেন তিথি ও পূরবী দেববর্মণ ও তাঁদের দলবল।

এমন অসাম্প্রদায়িক মিলনমেলা বাংলাদেশের সব জেলায় প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হলে দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ যেমন সুদৃঢ় হবে ও সমৃদ্ধ হবে, তেমনি অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি পরাভূত হবে। আর বাংলাদেশের মাটি থেকে যতদিন সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করা না যাবে, ততদিন শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত হবে এবং বারবার নাসিরনগর নাটক মঞ্চায়িত হবে। কালীকচ্ছ সম্মিলনীর সভাপতি ৬ষ্ঠ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী কালীকচ্ছ সম্মিলনী ২০১৭ কালীকচ্ছের মাটিতেই অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন।

হিমাদ্রিশেখর সরকার
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ছোটগল্পকার

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!

বেলাল চৌধুরীর একগুচ্ছ কবিতা

হাওড়া ব্রিজের ঠাট ও কারুকৃতি

বিশাল এক রূপালি ঢেউ যেন তার
পেলব ইস্পাত নির্মাণ– পেছনে
তাসের পিঠের ছবির মতন
চকচকে নীল এলুমিনিয়াম আকাশ;
অদূরে অবিশ্রাম প্রবহমানতায়
গুঞ্জরিত সধূম রেলস্টেশন।

বিশাল ব্যাপক প্রসার ও
ক্যান্টিলিভার অবস্থিতি তার
তাকে ঘিরে পল্লবিত বাহুডোরের মতন
অসংখ্য তার আর লোহা,
ধাতব পালকে তার
লৌহ টিপের ঝালর সজ্জা;

নগর কলকাতার নাগরী
বিপ্রলব্ধা কম্পিত হৃদয়
সে এক ধাতব রূপালি হাঁস
অটুট তার ছন্দ সংহতি–
উদ্বেলিত তরঙ্গে নৃত্যপর
তার দোদুল্যমান দেমাকী
ঠাট ও কারুকৃতি।

লালকেল্লায় ভোর

বাইরে তাকিয়ে দেখি মখমল সবুজ ঘাসের গালিচায়
এলিয়ে রয়েছে পৃথিবীর কোমল নরম রূপ:
আর পেঁজাতুলোর মতন সাদা মুক্তোদানা
বিন্দু বিন্দু শিশিরের ফোঁটা যেন মানুষের স্বেদ;

ভোর ভাঙছে ক্রমশ লালকেল্লার মাথায় ইটরঙা
যেন একটা খোসা ছাড়ানো হিমশীতল কমলালেবু
রক্তিমাভ রসে টইটম্বুর শিরা উপশিরার
– প্রায় লাফিয়ে ছুটতে শুরু করি নীরবে দ্রুত চরণে

জেগে ওঠা প্রথম দিনের সেই আদিম মানব আর
চলে যাওয়া মানুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে
অন্তহীন বিষাদ আর দুঃখ মাড়িয়ে মাড়িয়ে,
– লালকেল্লার ভোরটি কিন্তু সেগুলির একটাও নয়।

আপন অন্তরালে

প্রেম ও ভালবাসায় আয়নায় পদ্মা-মেঘনায় শান ও আলিসায়
রেস্তরাঁর টেবিলে শুঁড়িখানায় চশমার কাচে
পেয়ালা পিরিচে রসুইঘরে
দুধে চিনিতে এবং কোথায় নয়
ফাটল ধরেছে সর্বত্র, স্থলে-জলে, ফাটল মেলেছে
ডালপালা, ফাটল জেগেছে
শরীরময়;
কণ্ঠস্বরে সম্মিলিত শব্দসংঘ গণ্ডারের চামড়ায় গাছের শরীরে মগজের কুয়াশায়
প্রাসাদের ভিতে পায়ের নিচে জমিতে মৌচাকে
অন্তরীক্ষে কক্ষ-কক্ষান্তরে
প্রেমিকার বাৎসল্যে এবং কোথায় নয়
ফাটল ধরেছে সর্বত্র, খেত-জাঙালে, নদী-নালায়, পাহাড়ে-পর্বতে,
ফাটল জেগেছে ওতপ্রোত
সৌরসংসারে, নক্ষত্রখামারে।
জুতোর মধ্যে বালি কাঁকর ঢুকলে চোখের মধ্যে
কুটোকাটা পড়লে যেমন
এক ধরনের কনকনে অস্বস্তি করকর করে বাজতে থাকে সারা গায়ে
আমার মধ্যে তেমনি এক তুমুল ও ভঙ্গুর ভয়ঙ্কর
বাজনার আওয়াজ
শুনতে পাচ্ছি,
চিড়-ধরা আর্শিতে দেখছি কিছু ভাঙচোরা মানুষের
পাশে নিজের হতচ্ছাড়া
মুখচ্ছিরি
সদ্য মুণ্ডুকাটা ধড়ের মত ছটফট করছে
মানুষের রক্তলোলুপ হিংস্রতা
কাঁটাবনে মুরগি চোর শেয়ালের হাঁকাহাঁকিতে দায় হয়ে পড়ছে ঘরে টেকা
কিছু মানুষের স্ফটিক চোখে ডেলা
পাকাচ্ছে উর্মিমুখর প্রতিহিংসাপরায়ণ
রক্তোচ্ছ্বাস।
কেউ-বা চাইছে দরজার কুলুপ না এঁটে
ঘুমের বড়ির ঝিল্লিমন্ত্রে স্বর্গ থেকে বিদায়,
কারুর চোয়ালের নিচে হিজিবিজি রেখার কঠিন কাটাকুটি ও গভীর ফুটোর চিহ্ন
এই সব নিয়ে একেকজন বেঁচে থাকতে
চাইছে একেকভাবে, ললিত পেশিতে
দিচ্ছে কুড়োলের কোপ–
এই ফাটলের কোন প্রতিধ্বনি নেই সূচিভেদ্য অন্ধকার অবয়ব শুধু
রজ্জুর বিভ্রম।
ফাটল ধরেছে সর্বত্র, ফাটল মেলেছে কত অলিগলি,
ফাটল জেগেছে চামড়ায়
প্রবল বেলোর্মির মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'চোখ কচলে বাঙ্ময়
উদ্ধার আশায় আমিও
চ্যাঁচাচ্ছি, বলছি 'রক্ত চাই, রক্ত খাব অষ্টাদশীর,
রক্ত চাই কবুতরের'
আমার বুক জুড়ে শুধুই শোণিত পিপাসার তরল কলরব ও তরঙ্গভঙ্গ
বলতে বলতে আমার মুখের কষ বেয়ে গড়ায় অঝোর রক্তধারা–
রক্ত চেটে আমি হেসে উঠি,
বলতে চাই দ্যাখো রক্তের ভেতরেও কেমন আগ্রাসী ফাটল ধরেছে আজ
ফাটল মেলেছে তার লোল ও কর্কশ জিভ, ফাটল জেগেছে শরীরময়।

রক্তমাখা এই যে উদ্যত কাগুজে বাঘের মুখোমুখি আমরা যেমন
অজ্ঞাত হাওয়ার ফাটলের মধ্যে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়ে আছি
আমরা তো জেনে গেছি 'রাইফেলের নলই সকল শক্তির উৎস'
তবু ফাটলময় বসুন্ধরার উৎসে আজও প্রজাপতি
ফড়িং-এর প্রীতি-সম্মিলনী
আজ মানুষের হাতে হাতে রেশম ও রুমাল ওড়ে,
ঘাম ও কামের গন্ধমাখা
নবীন শস্যের মঞ্জরি, আঁটিবাঁধা ধান, স্বপ্ন দ্যাখে
মাটির স্পর্শে নবান্নের
আজও গামছায় মুখ মোছে, নারী ও শিশুর হাত ধরে এগিয়ে চলে
হারমোনিয়াম।
উন্মুক্ত বিবেকের জিভ নেই তাই আজ তারা এমন নির্বাক,
শূন্য চোখে শুধু তাকিয়ে দ্যাখে
কিছু বধির, নির্বোধ ও বাচাল কলের কোকিল কেমন অন্ধকার
কোটরে বসে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে...
ঐ হাওয়ার ফাটল ধরে আজ আমি চলে যেতে পারি পাতাল অবধি–
পাতাল কোথায়?
আয়োজন মশারি ও জলের ভেতর, হলুদাভ গ্রন্থের ভেতর
কেতকী কুসুমে
ফল ও আর্শির ত্বক পারদ আবরণ ভেদ করে আলো ফলার মতন,
সূর্য কিরণের মত ইথার তরঙ্গ কেটে, জলের মধ্যে চঞ্চল শফরী
যেমন ছলাৎছলাৎ রূপালি বুদ্বুদ কাটে–
এই হাওয়া, এই শাদা জুঁই ফুল কুঁচি, এই আলোর সূক্ষ্ম শরীর
ভেঙে যতদূর সম্ভব, যদ্দুর এবং যতদূর...

চলেছি দেশান্তর

আমার সমস্তটাই কেবল পাখির মতন ঠুকরে দেখা
ইষ্টিকটুম মিষ্টিকুটুম রাতবিরেতে ওলটপালট চড়ুইভাতি;
কিচিরমিচির শব্দশূলে এলোমেলো ঝাপটা মেরে– আবার
উধাও নিরুদ্দেশে, মেঘের মত হাওয়ার ডানায় লাফিয়ে পড়া।

মেঘের কোলে যেমন ক্ষণিক শোভায় রোদের ঝিলিক
মনোলোভা– এদিক ওদিক চিরিক-মিরিক নয়ন হরণ,
তেমনি আমি চলতে চলতে হঠাৎ থামি, রোদের ভ্রূকুটি!
– আবার মেঘলা মলিন বেলাশেষে উল্টো চরণ।

অস্তাচলে পথিক রবি, থমকে দাঁড়াই এক মুহূর্ত
ঘরের পানে ফিরে দেখি শুধু বরফ গলা সোনার পাত
দিগন্তলীন মেঘে মেঘে খুনখারাপি, ঘোড়ার ক্ষুরে বালির ঝড়
– এই সায়াহ্নে ফের দিকবদলের পালা, চলেছি দেশান্তর।

বাড়ি ফেরার পথ

দ্যাখো, দ্যাখো ওই ফুটপাতে পড়ে আছে সে–
ছিন্ন-ভিন্ন মলিন জামা আর চেঁড়াখোঁড়া নোংরা পাৎলুনে,
এক ফালি হাসির মত লেগে আছে ঠোঁটে
গত রাতের মন্দভাগ্য;
একদিন ছিল তার ভবিষ্যৎ প্রেমে স্বপ্নে
সুবর্ণমুদ্রায় অফুরন্ত
যা সে নির্বিচারে ফুঁকে দিচ্ছে বেপরোয়া ও উদ্দাম।

কোন ভাল কিংবা মন্দের জন্য তার প্রয়াস ছিল নিরন্তর
বেরিয়েছিল এক উৎসের সন্ধানে,
যা সে খুঁজে পায়নি কখনো
গন্ধক ও খনিজ শিলার স্তর
গলিত রূপ্যে, রত্ন, পাথর যে-কোন।
'বিশ্বাস', 'সত্য' এসব পাপ না আশীর্বাদ জানতো না সে
অথবা কোনটা ভাল–
স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
না জাহান্নামে যাওয়া
শুধুই সে দেখেছিল পথে অনেক অনেক কঙ্করাবৃত খোদ
ও নরকঙ্কাল, হাড়ের পাহাড়ে লোল বাজনার ঐকতান।

সে ছিল কবি, প্রকৃত ঈশ্বর প্রেরিত, প্রেমিক
তীর্থযাত্রী, পরিব্রাজক, হয়তো-বা প্রচারক
– এবং বন্ধু ও স্বজনদের কাছে এক ভয়ানক জীবন্ত সমস্যা
(এবং তখনই ওরা সমবেতভাবে ওকে ছুঁড়ে মেরেছিল
পাথরখণ্ড,
পরিয়েছিল রাশি রাশি থুতুর মালা?)
চলন্ত পরস্পরবিরোধী দুই বিপরীতের সমাহার
যার খানিকটা নকল, খানিকটা বাস্তব–
তার বাড়ি ফেরার পথ ছিল অনেক দীর্ঘ আর একলা
এবং ছিল সম্পূর্ণ ভুল নির্দেশে ভরপুর।

সে চেখেছে ভাল-মন্দ তোমাদের শোবার খাটে,
তোমাদের শুঁড়িখানায়–
আজকের জন্য সে বেচে দিয়েছিল আগামীকালকে
এইসব স্খলন-পতন থেকে পালাতে গিয়ে, প্রভু
হাত বাড়িয়েছিল সে নক্ষত্রে (নক্ষত্রদল তখন হিম, মৃত)
আর তখনই সে হল বিপথগামী ও বাস্তুচ্যুত;
এবং একে-একে পথেই হারাল তার অবলম্বন
ভালবাসার যা কিছু ছিল অবশিষ্ট।

অনেক অনেক ভুল তথ্য ও নির্দেশে ছিল কণ্টকিত
অনেক দীর্ঘ আর একা তার বাড়ি ফেরার পথ।

তর্পণ

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঋতা বসু

কলকাতা ১০ অক্টোবর, ২০০০।
ঢাকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পিয়ালীর। নবমী নিশিতে বন্ধুদের সঙ্গে ধুন্ধুমার হৈ-হল্লা হয়েছে। এবার তাদের আবাসন, টিভি চ্যানেল ও রঙ কোম্পানি মিলিয়ে পাঁচটা প্রাইজ পেয়েছে। প্রতিদিনই মাথায় ফুল গোঁজা বেনারসী পরা টিভির সঞ্চালিকাকে ম্লান করে তারাও পাল্লা দিয়ে সেজেছে। পিয়ালীর মন ভাল নেই। কাল থেকে রনো তাকে একটা ফোনও করেনি। এমনকি একটা এসএমএস পর্যন্ত না। নিশ্চয়ই রাগ হয়েছে। পিয়ালীর ভাবতে বেশ ভাল লাগে রনোর তার ওপরে রাগ হয়েছে অভিমান হয়েছে। বাস্তবে তেমন হয়েছে কি কখনও? সপ্তমীর সকালে যখন দেখা হয়েছিল তখনই কিন্তু পিয়ালী বারবার বলেছিল– আবাসন ছেড়ে বেরোতে পারব না। তুমি এসো। বিকেলে না পারলে সকালে। যদিও জানত রনো কখনও ওই হট্টমেলার মধ্যে আসবে না। তাই বলে একটা ফোন বা এসএমএসও করবে না? রনো দাড়ি রাখছে বলে মুখটা একটু অন্যরকম লাগছিল। পিয়ালী বলেছিল চেহারার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবটাও যেন বদলে যাচ্ছে। চারদিকে কেমন ফেস্টিভ মুড তুমি শুধু পেঁচার মত মুখ করে বসে আছ।

রনো বরাবরের মত পিয়ালীর অজস্র কথার উত্তরে একটু মুচকি হেসেছিল শুধু। পিয়ালী তার মসৃণ কপালে ভাঁজ ফেলে চিন্তা করল রাগ করবে কি করবে না। রাগ করাটা বোকামি হবে কারণ রনো যেচে তার রাগ ভাঙাবে এতটা আশা করা যায় না। আজ বিজয়া দশমী, তাই ঢাকের আওয়াজটাও বদলে গিয়েছে। বলছে আসছে বছর আবার হবে। আবার হবে আসছে বছর। পিয়ালী মোবাইলে বড় করে ক্যাপিটাল অক্ষরে লিখল– হ্যাপি বিজয়া। তারপর পাঠিয়ে দিল রনোর উদ্দেশ্যে।

ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে বাবার ঘরে এল পিয়ালী। বাবা কাগজ পড়ছে মন দিয়ে। পিয়ালীকে দেখে বলল– কি রে মুখটা পেঁচামার্কা কেন? পুজো শেষ বলে মন খারাপ?

পিয়ালীর কর্মকাণ্ড বাবার ভাল না লাগলেও ব্যবহারে তারতম্য ঘটে না মায়ের মত। বাবা পিয়ালীর স্বাধীনতায় কখনওই হস্তক্ষেপ করেন না। পিয়ালীর বিয়ে না করাটা কোনরকমে মেনে নিলেও যেদিন থেকে মা রনোর কথা জেনেছে সেদিন থেকে আর পিয়ালীর সঙ্গে এমন স্বাভাবিকভাবে কথা বলেননি।

– হুম– মা কোথায়?

– আবার কোথায়? মণ্ডপে। শেষ নতুন শাড়িটা পরতে হবে তো।

– শেষ কেন– এখনও লক্ষ্মীপুজো কালীপুজো যীশুপুজো সবই তো বাকি।

পিয়ালী চোরা দৃষ্টিপাত করল মোবাইলে। নাঃ তৈরি হয়ে মণ্ডপে যাওয়াই ভাল। অকারণ বিষণ্ণতা মুছে ফেলে স্নান সেরে ঘাস রঙের ওপর সাদা বুটি দেওয়া নতুন টাঙ্গাইল পরল। পুজো উপলক্ষে হাইলাইট স্ট্রিক করা রেশম চুলগুলো ফণা তুলে রইল কাঁধের ওপর। নতুন শাড়ির সুগন্ধ, ম্যাচিং জুয়েলারি জাদুকাঠির মত ছুঁয়ে দিল পিয়ালীকে। আর সে বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে একটা সবুজ প্রজাপতির মত উড়ে গেল এক ঝাঁক বন্ধু-বান্ধবের মাঝে। যাওয়া মাত্রই কলকল। এ ওকে কমপ্লিমেন্ট। খাওয়ার সময় রাজু বলল– দারুণ দেখাচ্ছে তোকে। টিন এজারদের কান কাটতে পারিস। রনো মিস করল। অত বুড়ো হলে এই হয়– নিল এনার্জি।

পিয়ালীর এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে রনোর প্রসঙ্গে বুড়ো শোনাটা। বিয়ে করার কথা তারা কেউ ভাবে না অথচ গায়ে গায়ে লেগেও আছে প্রায় তিন বছর। মা প্রথমদিকে প্রচুর কান্নাকাটি করেছে, বাবা গম্ভীর হয়ে থেকেছে তারপর দিনের সঙ্গে সে-সব চাপাও পড়ে গিয়েছে। পিয়ালী মা-বাবার একমাত্র সন্তান। স্বাস্থ্যবতী। নিজের বাড়ি। কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত। সুউপায়ী। সে নিজেই দু-দুখানা স্বামী পুষতে পারে। এমন মেয়ের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আর কতদিনই-বা টানা-হেঁচড়া করা যায়। রনোর কথা উঠতেই মোবাইলে চোখ পিয়ালীর। কত মেসেজ যে আসছে কিন্তু যারটা চাই তারই কোন পাত্তা নেই। যাক গে পিয়ালীও আর ভাববে না। থাকুক যে যার মত।

ঠাকুর বিসর্জনে যাবে আর একটু পর। মায়েরা সবাই তার আগে বরণ করল প্রতিমার মুখে মিষ্টি দিয়ে। জগজ্জননীর পায়ে সিঁদুর ঠেকিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দিল একে অন্যকে। পিয়ালীদের দলটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর বলাবলি করছিল– দেখ ঠিক মনে হয় কাঁদছে আমাদের ছেড়ে যেতে হবে বলে। কেউ গিয়ে মিষ্টি মুখে দিয়ে মাথায় সিঁদুর ছুঁইয়ে এল।

রাজু গম্ভীর মুখ করে পিয়ালীকে বলল– পরের বার ওই এয়োর দলে সিঁদুর নিয়ে দোল খেলবি তো? রাজু খুব ছোটবেলার বন্ধু বলে এখনও মাঝে মাঝে এই জাতীয় ঠাট্টা করে। বাকি সবাই নীরব তার ও রনোর সম্পর্ক নিয়ে।

চারিদিকের আলো-উৎসবের মাঝে আর একটা পিয়ালী একা ম্লানমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। যতই সে চেষ্টা করছে বিষণ্ণতাটা ঝেড়ে ফেলতে সেটা পায়ে পায়ে পোষা কুকুরের মত জড়িয়ে ধরছে। আসলে পিয়ালীর কোথায় যে লাগছে নিজেও ঠিকমত বুঝতে পারছে না। মা-বাবা কর্মক্ষেত্র বন্ধু-বান্ধব সব জায়গায় পিয়ালী যথেষ্ট শক্ত হতে পারে অথচ এই একটা জায়গায় কি কারণে যে সে বাঁধা পড়ে আছে নিজের কাছেও সেটা তেমন পরিষ্কার নয়। রনো কি সত্যিই তেমন কাঙ্ক্ষিত পুরুষ? হয়তো তার উদাসীন গা-আলগা ভাবটাই তাকে আরাম দেয় বেশি যেহেতু বিয়েতে পিয়ালীরও অনীহা। বিয়ে করে স্বামী ছেলেপুলের কথা ভেবেই তার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। আর তার ভাগ্যেই জোটে যত বিয়ে-পাগলা পুরুষ। রনোর আগে পিয়ালীর দু'তিনজনের সঙ্গে সম্পর্ক হলেও রনোর জীবনে সে একমাত্র নারী। এই অদ্ভুত মানুষটা তাকে ছাড়া আর কারোকে কোনদিন স্পর্শ করেনি এটা ভাবলে এখনও তার সমস্ত লোমকূপ শিরশির করে ওঠে। বাইরের পৃথিবী নিয়ে রনোর কোন আগ্রহ নেই। পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে বন্ধুত্ব করাও হয়ে ওঠে না কারও সঙ্গে। এই রকম একটা লোক যখন তাকে গভীর আলিঙ্গন করে অন্তরঙ্গতার চরমে পৌঁছয় তখন পিয়ালীর মনে মিলনের তৃপ্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন আর একটা অহঙ্কারও মিশে যায়।

সব সেরে মায়ের সঙ্গে পিয়ালী যখন ফ্ল্যাটে ঢুকল তখন রাত দশটা বাজে। মোবাইলের ইন বক্স শূন্য। পিয়ালী আর থাকতে পারল না– রনোর এহেন ব্যবহারের অর্থ কি? জামাকাপড় না ছেড়েই সে রিং করল। কয়েক মুহূর্ত পরে একটা ধাতব নারীকণ্ঠ বলে উঠল দ্য নাম্বার ইউ আর ডায়ালিং ইজ প্রেজেন্টলি সুইচড্ অফ।

রনো নিশ্চয়ই তাকে এড়ানোর জন্যই মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। টান মেরে শাড়িটা খুলে বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দিল পিয়ালী। মোবাইলটাও বন্ধ করে দিল। কারওকে দরকার নেই তার।

তাওয়াং ১২ অক্টোবর, ২০০০

ওয়ার মেমোরিয়ালের প্রশস্ত চত্বরে একজন উদ্বিগ্ন মুখের মহিলাকে ঘিরে সাত-আটজনের একটা দল কলবল করে কথা বলছিল। মহিলার বয়স ষাটের ওপর। তাঁর সাজপোশাক ও চেহারা দলের অন্যান্য মহিলাদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর উদ্বেগ প্রকাশের ধরনটিও বেশ অনন্য। করতলে মুখ রেখে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে আছেন। ভুরু কুঁচকানো মুখে ঝড়ের আগের থমথমে ভাব। কারও কোনও কথার উত্তর দিচ্ছেন না। সবাই মিলে কথা বলায় কারওর কথাই ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। একজন ভদ্রলোক মেমোরিয়ালের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বললেন–

ঋতা বসু। জন্ম কলকাতায়। আদি বাড়ি কুমিল্লা। পড়াশোনা শান্তিনিকেতন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। প্রিয় বিষয় রহস্য ও ইতিহাস। ছোটদের গল্প ও ছোটগল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ। ক্রমশ উপন্যাসেও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর সৃষ্ট পিন্টুমামা ও বাঘা এই চরিত্র দুটি তাদের রহস্যময় ও মজাদার কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠক সমাজে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গোয়েন্দা শতদল একেবারে চারপাশে ঘটে চলা অপরাধ ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠককে আবিষ্ট রাখেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত। ছোট বড় যে কোন ভ্রমণেই সমান উৎসাহী। চিন জাপানের প্রাচীন ক্যালকুলেশন পদ্ধতি শিখেছেন আগ্রহের সঙ্গে। লেখালেখির সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও টিচার্স ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। ছোটদের এবং বড়দের দু'ধরনের লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

আমি ঘরকুনো মানুষ, বেড়ানোর নামে আমার গায়ে জ্বর আসে। খিদিরপুর ঘুরে এলেও মনে হয় ভারত ভ্রমণ করে এলাম। শতদল হঠাৎ অরুণাচলের মধ্যে কি দেখল জানতে চেয়েছিলাম। শতদল বলেছিল– ওইখানে ম্যাকমেহন লাইন ধরে ১৯৬২-তে ভারত-চিনের যুদ্ধ হয়েছিল মনে নেই? আমরা অবশ্য তখনও জন্মাইনি।

নাঃ ওপরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। এইবার কিন্তু দত্তসাহেবের ফেরা উচিত। ভদ্রলোক না বলে কয়ে গেলেন কোথায়? সামান্য দূরে দাঁড়ানো পুরুষদের দলটার মধ্যে কয়েকজন বেশ ক্ষুব্ধ। দত্তসাহেব নামক লোকটার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যই এই রুষ্টতা। একজন দাড়িওয়ালা চশমাপরা ভদ্রলোক খুব কষ্ট করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটা সিমেন্টের বেদীর ওপর এসে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা বছর আট নয়ের বাচ্চা ছেলে এসে তাকে ধরল– এইবার আমাকে ম্যাজিক শেখাও। ছেলেটি পকেট থেকে তাস বার করে পাকা তাসুড়ের মত শাফল করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। দলের কয়েকজন তাওয়াং বাজার থেকে চাইনিজ ব্যাগ কিনেছে তার কারুকার্যে মুগ্ধ। শুধু একজনের দত্তসাহেবের জন্য সীমাহীন উদ্বেগের জন্য আমি দৃশ্যটা ছেড়ে যেতে পারছি না।

প্রবীর আর শতদল ওয়ার মেমোরিয়ালের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল খানিকটা বাদে। প্রবীর গরম জ্যাকেট খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছে। বলল– দিনের বেলা রোদের তেজ দেখেছেন? একে বলে রোদের কামড়। রাতের ঠাণ্ডা মোকাবিলা করতে গা সেঁকে নিই এই বেলা।

শতদল ওই দলটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল– ওরা এইরকম একটা জায়গায় এত হট্টগোল করছে কেন? যেখানে বাঙালি সেখানেই কেলো।

প্রবীর বলল– শতদলদা এই দলটাকেই তো আমরা গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে মিট করেছিলাম– মনে নেই?

– দল কোথায়? এক চালিয়াত চন্দ্র এসে নানারকম বকছিল। দশ মিনিটের মধ্যে তার নাড়ীনক্ষত্র জেনে গিয়েছিলাম।

– আমাকে বলছিল একটা দলের সঙ্গে এসেছে। দূর থেকে দেখেছিলাম দলে দুটো বাচ্চা– ওই দেখুন একটা ম্যাজিক শিখছে।

– হবে– শতদল এক মুহূর্তও অন্যদের দিকে মনোযোগ দিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না। আমাকে বলল– অত তাড়াহুড়ো করে চলে এলে কেন? আমি প্রত্যেকটা ঘর দেখলাম। প্রতিটা সৈন্যর নাম পড়লাম। কতগুলো রেজিমেন্ট– শিখ, গুর্খা, রাজস্থান। প্রায় তিন হাজার সৈন্য মারা গিয়েছিল ১৯৬২-র অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে।

প্রবীরও খুব উত্তেজিত– জানেন বেশ কতগুলো বাঙালি নাম দেখলাম। মুখার্জি, সরকার, নস্কর। আচ্ছা চৌধুরীগুলো কি বাঙালি?

শতদল বিরক্ত হয়ে দূরে দাঁড়ানো দলটার দিকে তাকিয়ে বলল– উফ্ কি হট্টগোল করতে পারে। এই রকম একটা জায়গায় এসে ইচ্ছে করে অত কথা বলতে?

আমি বললাম– কি করবে ওদের দলের একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

– বাচ্চা?

– না ওই প্রিন্টেড শাড়ির স্বামী।

শতদল হতাশ হয়ে বলে ওঃ ধেড়ে খোকার জন্য এত? আছে কোথাও কাছেপিঠে। নয়তো হোটেলে ফিরে গিয়েছে।

– কি করে যাবে? গাড়িগুলো এখানে।

প্রবীর বলল– যা খুশি করুক। চলুন। আমরা ষষ্ঠ লামার জন্মভিটেটা দেখে আসি।

আমি বললাম– তোমরা যাও। আমি এখানেই ছায়ায় একটু বসে থাকি।

শতদল প্রতিবাদ জানায়– না এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। ওখান থেকে ইচ্ছে হলে আমরা হয়তো নিচের গ্রামের দিকে হাঁটতে চলে যাব।

অগত্যা আরামের জায়গাটা ছেড়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। পাহাড়ী পথে এত ওঠানামা আমার সহ্য হয় না। কিন্তু প্রবীর আর শতদল যেন সব সময়ে উৎসাহে টগবগ করছে। প্রবীরের বন্ধু অরুণ ডেকা অরুণাচলের বর্ডার শহর তাওয়াংয়ে পুলিশ প্রধান হয়ে আসবার পর থেকেই প্রবীর আমাদের তাতাচ্ছিল– চলুন চলুন– অরুণাচলটা ঘুরে আসি। ওই রকম ভার্জিন ফরেস্ট ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। ওর বিউটিই আলাদা।

শতদল বলেছিল– বিউটি তো সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ছড়ানো। ওই জায়গাটা আমাকে টানছে অন্য একটা কারণে।

আমি ঘরকুনো মানুষ, বেড়ানোর নামে আমার গায়ে জ্বর আসে। খিদিরপুর ঘুরে এলেও মনে হয় ভারত ভ্রমণ করে এলাম। শতদল হঠাৎ অরুণাচলের মধ্যে কি দেখল জানতে চেয়েছিলাম। শতদল বলেছিল– ওইখানে ম্যাকমেহন লাইন ধরে ১৯৬২-তে ভারত-চিনের যুদ্ধ হয়েছিল মনে নেই? আমরা অবশ্য তখনও জন্মাইনি। ইতিহাসে পড়েছি নেফার যুদ্ধ। পুরো নাম নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি। এখন বলা হয় অরুণাচল। এই নামটা অবশ্য অনেক সুন্দর।

প্রবীর বলল– হ্যাঁ মায়ের কাছে শুনেছি সেই সময় তাঁরা সবাই জওয়ানদের জন্য সোয়েটার বুনতেন। সন্ধে হলেই সব অন্ধকার করে দেওয়া হত। কাচের জানালায় কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। সবাই যে যার সাধ্যমত দান করেছিল। আমার এক জেঠাইমা জানেন– তাঁর সব গয়না যুদ্ধের তহবিলে দান করেছিলেন।

– স্বাধীনতার মাত্র ১৫ বছর পরেই ওই যুদ্ধ, লোকের মনে তখনও দেশপ্রেমের কাঁটা খচ খচ করছিল। মাত্র তিন বছর আগে আমরা কত ধুমধাম করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পালন করলাম। তার পরের বছরগুলো নীরবে চলে গেল। আবার জেগে উঠব ষাট বছরের সময়ে। দেশপ্রেম বলতে এখন আমরা বুঝি দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান। সীমান্তে তো খুচখাচ যুদ্ধ লেগেই আছে। সৈন্যদের মৃত্যুর খবরই পাই। তার জন্য এখন আমাদের সিনেমা থিয়েটার পার্টি পলিটিকস কিছুই আর বন্ধ থাকে না। এই রকম একটা দুর্গম জায়গায় এলে সৈন্যদের জীবনটা কত কঠিন এটা বোঝা যায়। আমরা প্রতিকূল হাওয়ায় তিনদিনে হাঁপিয়ে যাই। এদের মাসের পর মাস বছরের পর বছর ডিউটি করতে হয়।

আমার খাবার টেবিলের ওপর অরুণাচলের ম্যাপ বিছিয়ে শতদল আর প্রবীর যাত্রাপথ ঠিক করেছিল। গৌহাটি থেকে গাড়ি নিয়ে ভালুকপং বমডিলা দিরাং হয়ে তাওয়াং। তিনদিন দু'রাত্রি লাগবে শুনে আমি আঁতকে উঠে বলেছিলাম– ফিরতেও তো হবে ওইভাবে– আমি নেই। আমাকে বাদ দাও তোমরা।

পথের সৌন্দর্যের বিবরণ ও রাশি রাশি ছবি দেখিয়েও তারা আমাকে রাজি করাতে পারেনি। অবশেষে অরুণ ডেকা একটি অপেক্ষাকৃত সহজ পথের সন্ধান দিল। গৌহাটি থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে সোজা তাওয়াং। দু'চার দিন থেকে ফিরবার পথে ধীরেসুস্থে আরও দু'জায়গায় রাত্রিবাস করে গৌহাটি। এটা অপেক্ষাকৃত সহজ ভেবে আকাশপথে তাওয়াং এসেছি। ট্যুরিজম এদিকে উন্নত নয় বলে ট্যুরিস্টের সংখ্যাও কম। রাজস্থান-কেরালার মত পায়ে পায়ে সাহেবরাও ঘুরছে না। অরুণ ডেকা ভাল হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করেছে। সন্ধেবেলা আড্ডা আর সকালবেলা অলস চরণে ঘুরে বেড়ানো সব মিলিয়ে যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিলাম

ততটা লাগছে না।

গৌহাটি এয়ারপোর্টে ওই বাঙালি ভদ্রলোকের কাছেই শুনেছিলাম তারাও তাওয়াং আসছে তবে গাড়িতে। আমরা হেলিকপ্টারে যাব শুনে উনি প্রায় হাহাকার করে উঠেছিলেন– এ হে এটা তো জানা ছিল না। তবে তো নিজেরাই আসা যেত। শুধু তাওয়াং আসারই প্ল্যান ছিল এত জায়গা না দেখলেও চলত। আমরা দিল্লির মানুষ ভাল করে কিছু জানিও না। ঝামেলা এড়াতে এদের সঙ্গেই জোট বাঁধলাম। দশরকম লোকের সঙ্গে বেড়াতে কেমন লাগবে কে জানে? যাই– বউয়ের জন্য চা নিতে এসেছিলাম। আমার বউ আবার চায়ের খুব ভক্ত। আসামের চা দার্জিলিংয়ের মত নয় জানি তবু গৌহাটিতে এসে এককাপ আসামের চা অন্তত খাওয়ানো উচিত– কি বলুন?

ভদ্রলোক চলে গেলে পর প্রবীর বলল– ভাগ্যিস আমার গিন্নী এই মালটিকে দেখেনি তাহলে আমার জান কয়লা করে ছেড়ে দিত– বলত দেখেছ কি দরদ বউয়ের জন্য– হ্যান ত্যান আরও কত কি।

প্রবীরের স্ত্রী তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে বেশিরভাগ সময়েই বাপের বাড়িতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অবনিবনা তা কিন্তু নয়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান বলে তারা কন্যার দেখাশোনা একটু বেশি পরিমাণেই করে থাকেন। আর প্রবীরও নিশ্চিন্ত হয়ে তার কাজে নিশ্ছিদ্র মনোযোগ দিতে পারে। আমার নারী বর্জিত আস্তানার অনন্ত স্বাধীনতা ও শতদলের সঙ্গ তার কর্মজীবনের প্রবল স্নায়ুচাপকে অনেকটাই শিথিল করে দেয়। তার অবসরের খানিকটা দেয় স্ত্রী-কন্যাকে। আর বেশিটাই আমাদের সঙ্গেই কাটিয়ে দেয়। এই ছুটিটা অনায়াসে সে তার পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারত। সে কথা তাকে বলামাত্র বলেছিল– মরে যাব অভিমন্যুদা। সাতদিন লাগাতার নানারকম শাড়ির গল্প, মার্কেটিং আর যত ভাল হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করুন না কেন অব্যবস্থার ব্যবস্থা করতে করতে একেবারে মরে যাব।

এই প্রথম আমরা তিনজন একসঙ্গে বেড়াতে এসেছি। উপভোগের মাত্রা সবার ক্ষেত্রেই সমান। যদিও পুলিশ আর গোয়েন্দার মণিকাঞ্চনযোগে যে কোন সময়েই বেড়ানো চটকে যেতে পারে।

ষষ্ঠ লামার জন্মভিটে দেখে যা হতাশ হলাম বলার নয়। সাধারণ একটা গ্রাম্য বাড়ির সামান্য একটু উঠোন। দাওয়ায় এক ধর্মপ্রাণ তিব্বতি পরিবার শুয়ে-বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। প্রবীর বলল– যতই হোক ধর্মস্থান বলে কথা– আমি একটু ওদিক থেকে জলত্যাগ করে আসি। প্রবীর ঘন সবুজ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। শতদল বলল– সাবধানে যেও। এদিকের জঙ্গল নানারকম বিষাক্ত পোকামাকড়ে ভর্তি। কামড়ালে ভোগান্তি আছে। আমি তিব্বতি পরিবারটার পাশে বসে চারপাশের জঙ্গলে ভরা পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। একসঙ্গে ভাল লাগা ও ছমছমে একটা ভয় ছড়িয়ে যাচ্ছিল আমার মনের মধ্যে। এইরকম গহন বন ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। অরুণাচলের জঙ্গলে এমন বহু জায়গা আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পা পড়েনি। হঠাৎ মনে হল প্রবীর এত দেরি করছে কেন? কোন বিপদ হয়নি তো? শতদলই বা কোথায় গেল? হঠাৎ প্রবীরের চিৎকার ভেসে এল। – শতদলদা অভিমন্যুদা শিগগির আসুন এদিকে।

শতদল কাছেই কোথাও ছিল। সে ও আমি প্রবীরের চিৎকার অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। প্রবীর দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ধারে তার হাতে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা। তাকে বহাল তবিয়তে দেখে শতদল জিজ্ঞেস করল– হঠাৎ অমন করে চেঁচালে কেন?

– ক্যামেরাটা পড়েছিল এখানে আর এদিকে এসে নিচের দিকে তাকান তাহলেই বুঝবেন কেন চেঁচালাম।

কুড়িফুট নিচে পাহাড়ি রাস্তায় একটা দেহ পড়ে আছে। তাকে ঘিরে ভিড় করে আছে দশ-বারোজন গ্রামবাসী। প্রবীর বলল– এইখান থেকে ছবি তুলতে গিয়ে অসাবধানে পা হড়কে নিচে পড়ে গিয়েছে। শতদল বলল– চল দেখে আসি যদি বেঁচে থাকে।

আমরা গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম অকুস্থলের দিকে। আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে গ্রামের লোকজন একটু সরে দাঁড়াল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ভদ্রলোককে দেখে আমরা তিনজনই চমকে উঠলাম। গৌহাটি এয়ারপোর্টে ইনিই এসে আলাপ করেছিলেন। ভদ্রলোকের পরনে কালো প্যান্ট। গাঢ় ছাইরঙের পুরোহাতা সোয়েটার। শরীরের অন্য জায়গার আঘাত আপাতত বোঝা যাচ্ছে না। মাথার কাছের জমি রক্তে লাল হয়ে আছে। দেহে প্রাণ নেই।

শতদল উবু হয়ে বসে কাছ থেকে মৃতদেহটা দেখল ভাল করে। ইশারায় প্রবীরকে ডেকে বলল– মাথার পেছনের এই ক্ষতচিহ্নটা দেখ ভাল করে।

এই সময় একজন মাতব্বর গোছের লোক একটি ১৫/১৬ বছরের ছেলেকে পেছন থেকে আমাদের কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল– মরণে কা পহলে উও আদমী ইসসে কুছ বাতায়া।

প্রবীর সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল– কেয়া বোলা উনহোনে?

– উও যব উপরসে গিরা তবভি কুছ দেরতক জিন্দা থা। ম্যায় যব নজদিগ গয়া উও উপর হাত দেখায়া অওর কুছ মাঙ্গা– শায়দ পাণি–

শতদল জিজ্ঞেস করল– কি করে বুঝলে কিছু চাইছে?

– বহত কোশিশ করকে হাত উঠায়া অওর বোলা– মাঙ্গা জি

– মাঙ্গা জি? ভাল করে শুনেছ?

– বিলকুল।

– তারপর?

– অওর কুছ নেহী। দোবার বোলা। ম্যায় বহত ধ্যান সে শুনা লেকিন উসকে বাদ কুছ ভি নেহী।

শতদল প্রবীরকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল– ফোন করে অরুণকে আসতে বল। এই বডি পোস্টমর্টেম হওয়া দরকার।

– বডি তো এমনিতেই পোস্টমর্টেম হবে। এর জন্য অরুণকে ডাকার দরকার আছে কি?

– এটা সিম্পল এ্যাকসিডেন্ট নয়!

– তাই? প্রবীর মুহূর্তে সিরিয়াস। পকেট থেকে মোবাইল বার করে অরুণকে জায়গাটা বুঝিয়ে দিল। অরুণাচলে বিএসএনএলের পোস্ট পেড কানেকশন ছাড়া আর সব অচল। তাই যোগাযোগের জন্য আমরা সর্বতোভাবেই প্রবীরের ওপর নির্ভরশীল। প্রবীর জিজ্ঞেস করল– কি করে বুঝলেন এটা খুন?

– মাথায় মুখে ছোট বড় অনেক রকম ক্ষতচিহ্ন আছে। ইন্টারনাল ড্যামেজও হয়তো আছে যেটা আমরা ওপর থেকে বুঝতে পারছি না। কিন্তু সাদা চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি মাথার পেছনে গোল গভীর ক্ষত চিহ্ন। ওটা কোন গোলাকার জিনিস দিয়ে জোরে মারার ফল। হয়তো চারপাশে ছড়ানো এই সবের মধ্যেই কোন একটা পাথর।

ষষ্ঠ লামার জন্মভিটে দেখে যা হতাশ হলাম বলার নয়। সাধারণ একটা গ্রাম্য বাড়ির সামান্য একটু উঠোন। দাওয়ায় এক ধর্মপ্রাণ তিব্বতি পরিবার শুয়ে-বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। প্রবীর বলল– যতই হোক ধর্মস্থান বলে কথা– আমি একটু ওদিক থেকে জলত্যাগ করে আসি। প্রবীর ঘন সবুজ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

– পড়ার সময় কোন পাথরে গেলেও তো হওয়া সম্ভব?

– সে ক্ষেত্রে ধাক্কায় আশেপাশের হাড়ও ড্যামেজ হত। এমন নিটোল গোল ক্ষত দেখতে পেতে না। তা ছাড়া পড়ার ভঙ্গিটা দেখ মাথায় মেরে কেউ পেছন থেকে ধাক্কা দিলেই এভাবে পড়বে। পোস্টমর্টেম হলে আরও ভাল করে জানতে পারবে। আমার ধারণা ক্যামেরাটা এই ভদ্রলোকেরই। মাথায় আচমকা আঘাত পাওয়ায় হাত থেকে পড়ে গিয়েছে।

– ওঁর পদবী দত্ত। সঙ্গে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই– আমি আস্তে করে মৃত ব্যক্তির বিষয়ে যতটুকু জানি বলে দিলাম।

– কি করে জানলে?

– ওয়ার মেমোরিয়ালের ওখানে দলের লোকেরা বলাবলি করছিল– মি. দত্তকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁর স্ত্রী খুবই চিন্তা করছিলেন। মনে তো হল একাই। সঙ্গে ছেলেমেয়ে নেই। কেউ কেউ রাগও করছিল কাউকে না বলে চলে যাবার জন্য। এদিকে দেখ কি কাণ্ড।

শতদল বলল– আর কি করা যাবে অরুণ এসে মৃতদেহের সদ্গতি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

শতদল রুমাল দিয়ে একটা বড়মত পাথরের ওপরটা ঝেড়ে নিয়ে দিব্যি বসে পড়ল। চারপাশে ছড়ানো পাথর দেখে ভেতরে ভেতরে আমি একটু শিউরে উঠলাম। এর মধ্যে কোনটা সেই মারণ অস্ত্র কে জানে। প্রবীর পেশাগত কারণে সুস্থির হতে পারছে না। যতক্ষণ না অরুণ ডেকা এসে ভার গ্রহণ করে ততক্ষণই তারই দায়িত্ব এমন ভাব করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার এরই ফাঁকে শতদলকে বলে গেল এখন বুঝতে পারছেন তো কেন শ্বশুর-শাশুড়ি বউ বাচ্চার সঙ্গে বেড়াতে যাই না। আকাশ থেকে ডেডবডি খসে পড়ে শুধু আপনি সঙ্গে থাকলে।

অরুণ সঙ্গে করে গাড়ি নিয়েই এসেছিল। বলল– তাওয়াংয়ে তো কোন ব্যবস্থা নেই। আর্মির সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের হেলিকপ্টারে ডেডবডি গৌহাটি পাঠাতে হবে। আপনারা আমার গাড়িতে আসুন যেতে যেতে বাকি কথা হবে।

অসমীয়া ভাষাটার সঙ্গে বাঙলার এমনিতেই বেশ মিল আছে। মনে হয় কেউ যেন আধো আধো স্বরে বাঙলা বলছে। অরুণ কলকাতার স্কুলে পড়াশুনো করার জন্য বাঙলাটা ভাল বললেও খাঁটি বাঙলা কথ্য শব্দ উচ্চারণে তার অনভ্যস্ত জিভ হোঁচট খায় আর প্রবীর ঠাট্টা করে। ডেডবডি পাঠাবার ব্যবস্থা করে অরুণ যখন আমাদের সঙ্গে গাড়িতে এসে বসল তখন তাকে সামান্য ক্লান্ত লাগছিল। বলল– এখানে আসার ঠিক আগে ফ্রেন্ডস বলে একটা ট্র্যাভেল কোম্পানি থেকে তাদের একজন ট্যুরিস্ট মিসিং বলে ডায়েরি করাতে এসেছিল।

– ইনিই সেই লোক– নাম মলয় দত্ত বলেছে তাই না? নিজের অবদানে বেশ খুশি হলাম।

অরুণ একটু অবাক হল– আপনারা চিনতেন নাকি?

– হ্যাঁ আলাপ হয়েছিল গৌহাটি এয়ারপোর্টে। খুবই পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক।

– চেহারা দেখে বয়স মনে হচ্ছে ৬৫-৬৬। এই বয়সের নিরীহ একজন বাঙালি ট্যুরিস্টকে কেউ খুন করতে পারে এটা আপনার কেন মনে হল শতদলদা? অরুণ ডেকার প্রশ্ন শুনে মনে হল শতদল খুন সন্দেহ করে তাকে বেজায় বিপদে ফেলে দিয়েছে।

শতদল বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। অন্ধকার গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে পাহাড়ের তলা থেকে। শুধু ময়লা একটা আলো পাহাড়ের মাথায় লেগে আছে। জঙ্গলের সবুজ দূর থেকে ঘন জমাট কালো রহস্যময়। বাঙলাদেশে অন্ধকার জঙ্গলে তারার মত জোনাকি জ্বলে বলে সেটা অত ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে বরং রূপকথারই আমেজ নিয়ে আসে। এখানে ঠাণ্ডা হিমেল রাতে শুধু গাড়ির হেডলাইট সম্বল করে পথ চলা। হঠাৎ গাড়ির ভেতরটা বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অরুণ বলল– ফ্রেন্ডসের দলটা উঠেছে তাওয়াং ভ্যালি হোটেলে। আপনাদের পাশেই। ওদের গিয়ে খবরটা দিই আগে।

– তদন্ত কিভাবে করবেন ভাবছেন? শতদল জিজ্ঞেস করল।

– ডেডবডি কাল পৌঁছবে গৌহাটি। খুন কিনা ডেফিনিটলি জানা যাবে আরও তিনদিন পর। অফিসিয়ালি অরুণাচল পুলিশেরই তদন্ত করার কথা কিন্তু দলটা কলকাতা থেকে এসেছে। আর ফরচুনেটলি কলকাতা পুলিশের এক রিপ্রেজেন্টিভও উপস্থিত আছে অতএব যৌথভাবে করা যেতে পারে।

– তাহলে আগে আমাদের নাবিয়ে দিন। খুন প্রমাণ হয়নি হাতে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টও নেই। এই অবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকলে তদন্তের সুবিধে।

অরুণ চটপট কাজের কথা সারে– তাহলে দলের সবার পরিচয় ডিটেলে লিখে নিয়ে আসি। তাওয়াং আসতে সবারই ভোটার্স আইডি লাগে। সুতরাং এখানে নকলি কেউ নেই। পেশাগতভাবে কে কি করে ইত্যাদি– আর ভদলোককে শেষ কে দেখেছে যা রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সব কিছু জেনে নিই। কাজটা এগিয়ে থাকবে। খুনটুন বলে এখনই প্যানিক সৃষ্টি করার দরকার নেই।

প্রবীর বলল– আর ভদ্রমহিলা যদি তার স্বামীর ডেডবডি দেখতে চান?

অরুণ বলল– অবশ্যই দেখবেন। আইডেন্টিফিকেশনের জন্য তো এখনই একবার যেতে হবে। তবে উনিও তো তিনদিনের আগে গৌহাটি পৌঁছতে পারবেন না। টেঙ্গায় ধস নেমেছে। কালকের মধ্যে রাস্তা ঠিক হবে কিনা জানি না। হেলিকপ্টারে একা যাওয়াটা এই অবস্থায় ঠিক হবে না। গৌহাটিতেই-বা কে ওকে কম্পানি দেবে? দলের সঙ্গে থাকাই ভাল।

প্রবীর উত্তেজিতভাবে বলল– শতদলদা ফেরার পথে যদি আমরা ওদের সঙ্গে ভিড়ে যাই– রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।

• আগামী সংখ্যায়

ঋতা বসু ভারতীয় কথাসাহিত্যিক

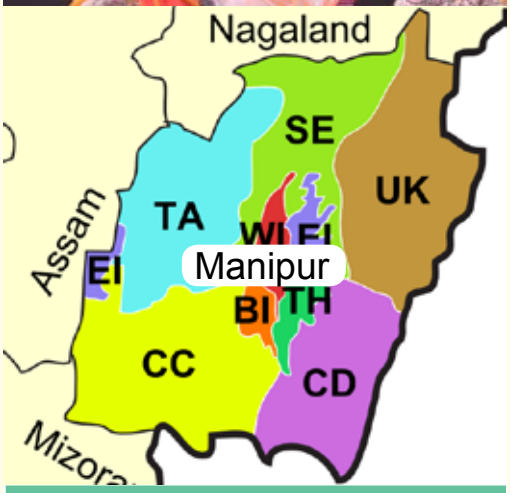

এক নজরে মিজোরাম

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	ইম্ফল
জেলা	১৬টি
প্রতিষ্ঠা	২১ জানুয়ারি ১৯৭২
সরকার	
• শাসকবর্গ	মণিপুর সরকার
• রাজ্যপাল	নাজমা হেফতুল্লাহ্
• মুখ্যমন্ত্রী	ওকরাম ইবোবি সিং
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট (৬০টি আসন)
• হাইকোর্ট	মণিপুর হাইকোর্ট এলাকা
আয়তন	
• মোট	২২,৩২৭ বর্গকিমি (৮,৬২১ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	চব্বিশ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	২,৮৫৫,৭৯৪
• ক্রম	চব্বিশ
• ঘনত্ব	১৩০/বর্গকিমি (৩৩০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-MN
সরকারি ভাষা	মেইতেই (মণিপুরি)
ওয়েবসাইট	www.manipur.gov.in

নাজমা হেপতুল্লাহ্

ওকরাম ইবোবি সিং

রাজ্য পরিচিতি

মণিপুর

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। এর উত্তরে নাগাল্যান্ড, দক্ষিণে মিজোরাম, পশ্চিমে আসাম এবং পূর্বে বর্মা (মায়ানমার)। রাজ্যের ক্ষেত্রফল ২২ হাজার ৩২৭ বর্গ কিলোমিটার (৮ হাজার ৬২১ বর্গমাইল)। মেইতেই, কুকি, নাগা ও পাঙ্গাল জনগোষ্ঠী নিয়ে জনসংখ্যা ৩০ লাখ, যাদের ভাষা চিনা-তিব্বতী। মণিপুর আড়াই হাজারের বেশি বছর ধরে এশীয় অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সংযোগস্থল। মানুষ, সংস্কৃতি ও ধর্মের অভিবাসনের মাধ্যমে মণিপুর ভারতীয় উপমহাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে মণিপুর ছিল রাজা-শাসিত। ১৯১৭ থেকে '৩৯ সাল পর্যন্ত মণিপুরের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে। ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে মণিপুরের রাজা বর্মার চেয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আলোচনা থেমে যায়। ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মহারাজা বুধচন্দ্র ভারতে যুক্ত হবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন। জনমতের তোয়াক্কা না করে ভারতে সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সেখানে প্রায় ৫০ বছর ধরে জনবিদ্রোহ চলে।

মণিপুরের জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মেইতেই জাতিগত গোষ্ঠী। মেইতেই

গোপীনাথ মন্দির

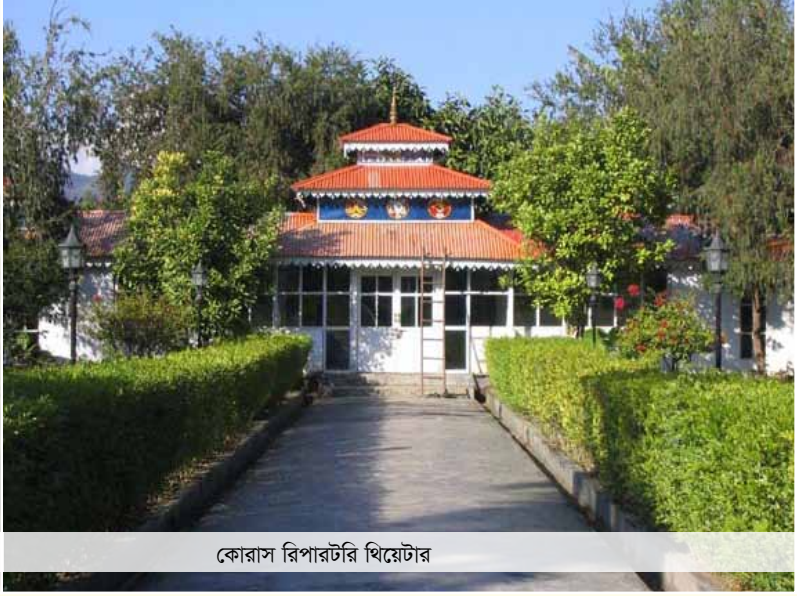

কোরাস রিপারটরি থিয়েটার

(মণিপুরি) রাজ্যের প্রধান ভাষা। তুলনায় দেশীয় উপজাতীয় মানুষের সংখ্যা ২০ শতাংশ। এই উপজাতীয়দের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা এবং তারা সাধারণত গ্রামে বাস করে। মণিপুরে হিন্দুধর্মই প্রধান, তারপরেই আছে খ্রিস্টধর্ম। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আছে ইসলাম, সনমাহিবাদ, বৌদ্ধবাদ ইত্যাদি।

মণিপুরের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। রাজ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ইম্ফল বিমানবন্দরে দৈনিক উড়ালের মাধ্যমে মণিপুর ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত। মণিপুরী নাচ এবং ইউরোপীয়দের 'পোলো' মণিপুরকে বিখ্যাত করেছে।

নামের উৎপত্তি

বিষ্ণুপুর, ঠুম্বল ও ইম্ফল– মাত্র এই তিনটি উপত্যকা জেলায় প্রচলিত *কাংলেইপক* বা *মিতেইলেইপক* নামের ঐতিহাসিক বইয়ে মণিপুরের উল্লেখ আছে। সনমাহি লইকন লেখেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেইডিংগু পামহেইবার শাসনামলে রাজকর্মচারীরা মণিপুরের নতুন নামকরণ করেন। সাকোক লামলেনের মতে, ইতিহাসে এলাকাটির বিভিন্ন নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। হায়াচাক আমলে এর নাম ছিল *মায়াই কোইরেন পোইরেই নামঠাক সরোনপুঙ* বা *টিল্লি কোকটোং আহাম্বা*; খুনুংচাক আমলে নাম ছিল *মীরা পোংঠোকলাম*। লাংবাচাক যুগে নাম ছিল *টিল্লি কোকটোং লেইকোইরেন* এবং সবশেষে কোন্নাচাক যুগে *মুয়াপালি*।

প্রতিবেশী সংস্কৃতি মণিপুর ও এর জনগণকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছে। শান বা পোং জনগণ এলাকাটিকে বলত কাসে, বার্মিজরা বলত কাঠে, আর অসমীয়রা বলত মেকলি। ১৭৬২ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও মেইডিংগু চিংঠাংখোম্বা (ভাগ্যচন্দ্র)-র মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তিতে রাজ্যটিকে মেকলে নামে উল্লেখ করা হয়। ভাগ্যচন্দ্র ও তাঁর উত্তরসূরীরা 'মণিপুরেশ্বর'-এর মূর্তিখচিত মুদ্রার প্রচলন করেন। কালক্রমে ব্রিটিশরা 'মেকলে' নামে বর্জন করে। পরে *ধরণী সংহিতা* (রচনাকাল ১৮২৫-৩৪) মণিপুরের নামের উৎপত্তির সংস্কৃত কিংবদন্তি জনপ্রিয় করে তোলে।

ইতিহাস

মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ও বিতর্কিত। একটি ধারায় বলা হচ্ছে, মণিপুরের মানুষেরা গন্ধর্ব নৃত্যগীতকারী। বৈদিক ও ঐতিহাসিক বইপত্রে মণিপুরী লোকজন তাদের অঞ্চলকে বলত 'গন্ধর্বদেশ'। মহাভারতে মণিপুরের উল্লেখ আছে, এখানেই অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন। মণিপুর ঐতিহ্যের কিংবদন্তী প্রেমকাহিনি খাম্বা-ঠেবির অংশ হচ্ছে শিব-পার্বতী।

আরেকটি ধারায় মণিপুরকে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যপথ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। সেই ধারায় প্রধানত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষ-সংস্কৃতি-চিন্তাধারার অভিবাসন প্রভৃতি মিলিয়ে একে ইন্দো-বর্মা সংস্কৃতির ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মধ্যযুগে মণিপুর রাজ-পরিবারের সঙ্গে অহোম ও বার্মিজ রাজ-পরিবারের হামেশাই বিয়ে হত। বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত মধ্যযুগীয় মণিপুরী পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, রাজ-পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুদের এখানে আগমন ঘটেছে। তারপরের কয়েক শতাব্দীজুড়ে আধুনিক আসাম, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বৈবাহিকসূত্রে হিন্দুদের আগমন অব্যাহত রয়েছে। আরেকটি পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, মণিপুরে মুসলিমদের আগমন সপ্তদশ শতাব্দীতে অধুনা বাংলাদেশ থেকে মেইডিংগু খাগেম্বার আমলে। সামাজিক-রাজনৈতিক ওলট-পালট ও যুদ্ধবিগ্রহ মণিপুরের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জনসংখ্যার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

মণিপুর রাজ্য হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মণিপুরে জাপানী অবরোধকারী ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মণিপুরে ঢোকার আগেই জাপানীদের পর্যদস্ত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের মণিপুর সংবিধান অনুযায়ী মহারাজাকে নির্বাহী প্রধান করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে মহারাজা বোধচন্দ্রকে শিলংয়ে ডেকে এনে ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হবার চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়। তারপর আইনসভা ভেঙে দিয়ে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে মণিপুর ভারতের অংশে পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১৯৭২ সালে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

ভূগোল

মণিপুর ২৩°৮৩' – ২৫°৬৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩°০৩ – ৯৪°৭৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল ২ হাজার কিমি (৭শো বর্গমাইল) ক্ষেত্রফলের একটি ডিম্বাকৃতি উপত্যকা, যার চারপাশে নীল পর্বত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৭৯০ মিটার (২ হাজার ৫৯০ ফুট)। ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখী। চারিদিক পর্বতবেষ্টিত হওয়ায় উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া যেমন ঢুকতে পারে না, তেমনি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ও প্রবেশাধিকার পায় না। ফলে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ।

রাজ্যে ৪টি প্রধান নদীক্ষেত্র (river basin)– পশ্চিমে বরাক

মণিপুর পর্বতে একাকী বৃক্ষ

ইম্ফল বিমান বন্দর

ইম্ফল শহর

নদীক্ষেত্র (বরাক উপত্যকা), মধ্য-মণিপুরে মণিপুর নদীক্ষেত্র, পূর্বে যু নদীক্ষেত্র এবং উত্তরে লেনাই নদীক্ষেত্র। বরাক ও মণিপুর নদীক্ষেত্রের জল সম্পদ প্রায় ১.৮৪৮৭ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। রাজ্যের বার্ষিক জল-বাজেটে সার্বিক জলসাম্য হচ্ছে ০.৭২৩৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। সেই তুলনায় ভারতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের জল প্রায় ৪০০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার।

মণিপুর পাহাড়শ্রেণী থেকে উদ্ভূত মণিপুরের সবচেয়ে বড় নদী বরাকের সঙ্গে ইরাং, মাকু ও টুইভই শাখা নদী যুক্ত হয়েছে। টুইভইয়ের সঙ্গে মিশে বরাক উত্তরে প্রবাহিত হয়ে আসামের সঙ্গে সীমান্ত তৈরি করেছে এবং লখিপুরের কাছে আসামের কাছাড়ে প্রবেশ করেছে। মণিপুর নদীক্ষেত্রের ৮টি প্রধান নদী। এগুলি হচ্ছে: মণিপুর, ইম্ফল, ইরিল, নাম্বুল, সেকমাই, চাপকি, ঠৌম্বল ও খুগা। সব নদীরই উৎপত্তি চারপাশের পাহাড় থেকে।

উপত্যকার সব নদীই পরিণত। কাজেই সব পলি লোকতাক হ্রদে জমা হয়। মণিপুর পর্বত থেকে সৃষ্ট নদীগুলি হচ্ছে মাকু, বরাক, জিরি, ইয়াং ও লেইমাতাক। যু নদীক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের নদীসমূহের মধ্যে রয়েছে চামু, খুনৌ ও অন্যান্য স্বল্পদৈর্ঘ্য নদী।

পর্বত ও সংকীর্ণ উপত্যকার মাঝে আছে মালভূমি যা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বসতি। মধ্যবর্তী সমতলে অবস্থিত লোকতাক হ্রদের ক্ষেত্রফল প্রায় ৬০০ বর্গ কিমি। পাহাড়ের মাটি ফেরোজিনাস, উপত্যকার মাটি পলিমাটি। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রাজ্যের ১৪ হাজার ৩৬৫ বর্গ কিমি অর্থাৎ প্রায় ৬৪ শতাংশ এলাকা জুড়ে আছে। দীর্ঘ ঘাস, নল, বাঁশ ও অন্যান্য গাছগাছালি নিয়ে মণিপুরের বনাঞ্চলকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আধা-চিরহরিৎ, উষ্ণ তাপমাত্রার বনভূমি, উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাইন ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাষ্পীয় পর্ণমোচী বনভূমি – চারভাগে ভাগ করা যায়। এখানে সেগুন, পাইন, ওক, ইউনিংথো, লেইহাও, বাঁশ ও বেত বন রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে রাবার, চা, কফি, কমলা ও এলাচ জন্মায়। ভাত মণিপুরীদের প্রধান খাদ্য। অন্যান্য অর্থকরী ফসলও মণিপুরে বেশ জন্মায়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৯০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত মণিপুর পর্বতবেষ্টিত হওয়ায় আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, যদিও শীত কিছুটা বেশি। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২° সেলসিয়াস (৯০° ফারেনহাইট। শীতকালে তাপমাত্রা কখনো কখনো ০° সেলসিয়াসের (৩২° ফারেনহাইট) নীচে নেমে যায় বলে পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত হয়। জানুয়ারি শীতলতম ও জুলাই উষ্ণতম মাস। মে থেকে মধ্য-অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ১ হাজার ৪৬৭.৫ মিলিমিটার (৫৭.৭৮ ইঞ্চি)। সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় ইম্ফলে ৩৬.৭ ইঞ্চি, বেশি হয় তামেংলংয়ে ১০২.১ ইঞ্চি।

সাঙ্গাই হরিণ (ব্রো এন্টলরেড ডিয়ার)

জনমিতি

মণিপুরের জনসংখ্যা ২৭ লাখ ২১ হাজার ৭৫৬। এর মধ্যে ৫৮.৯ শতাংশ উপত্যকায়, বাকি ৪১.১ শতাংশ বাস করে পার্বত্য অঞ্চলে। পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানত কুকি, নাগা ও জোমিরা বাস করে। উপত্যকায় ক্ষুদ্র উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং প্রধানত মেইতেই, মণিপুরী ব্রাহ্মণ ও পাঙ্গাল (মুণিপুরী মুসলমান)দের বসবাস। উপত্যকা এলাকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, নাগা ও কুকি বসতি স্থাপনকারীদের দেখা যায়।

মণিপুরে মেইতেইরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৮৯১ সালের জনগণনায় মেইতেইদের বনবাসী উপজাতি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। এর ১০ বছর পর এদের মণিপুরের প্রধান উপজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করাহয়। মেইতেইদের ভারতীয় সংবিধানে তপসিলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বহিরাগতরা এদের ভুলভাবে উপজাতি তকমা লাগিয়ে দিয়েছে। মেইতেইদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। তাদের সভ্যতার সূচনা ৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কুকি ও নাগারা প্রধান উপজাতীয় গোষ্ঠী। নাগাদের আরো উপগোষ্ঠী রয়েছে। যেমন, টাংখুল, মারাম, পৌমাই নাগা, সুমি, আঙ্গামি, আও, চাখেসাং চাং, খিয়ামনিউনগান, কোনিয়াক, লিয়াংমাই, লোঠা পোচুরি, রোংমেই, জেমে ও মাও।

মণিপুরে মেইতেই ভাষায় কথা বলে ৫৩ শতাংশ মানুষ। ঠাডৌ-কুকি ভাষায় ৮.৫৫ শতাংশ, ঠাংখুল ৬.২৫ শতাংশ, কাবুই ৩.৬৩ শতাংশ, পাইতে ১.৯৪ শতাংশ, হ্মার ১.৬৯ শতাংশ, বাংলা ১.১৩ শতাংশ ও অন্যান্য ভাষায় ২৩.৮১ শতাংশ মানুষ কথা বলে। রাজ্যের সরকারি ভাষা মেইতেই ও ইংরেজি। মেইতেই ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপসিলভুক্ত ভাষা। মণিপুরে মোট ২৯টি ভাষা প্রচলিত আছে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মণিপুরে হিন্দু ৪১.৩৫ শতাংশ, খ্রিস্টান ৪১.২৫ শতাংশ, ইসলাম ৮.৩৯ শতাংশ, সনমাহিবাদী ৮.১৮ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.২৪ শতাংশ, শিখ ০.০৫ শতাংশ, জৈন ০.০৫ শতাংশ, ধর্মহীন মানুষ ২.৯৮ শতাংশ।

মেইতেই জনগোষ্ঠী প্রধানত হিন্দু। মণিপুরী হিন্দুরা বৈষ্ণব মতাবলম্বী। এখানে বৈষ্ণববাদের প্রসার ঘটে রাজা গরীব নিবাস (Garib Niwas)-এর সময় (১৭০৮-৪৮) থেকে। তিনি একে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করেন। মণিপুর উপত্যকার বিষ্ণুপুর, ঠৌম্বল, ইম্ফল (পূর্ব ও পশ্চিম) জেলা হিন্দু-অধ্যুষিত।

এরপরেই মণিপুরী খ্রিস্টানদের অবস্থান। উনবিংশ শতাব্দীতে মণিপুরে খ্রিস্টান মিশনারীদের হাত ধরে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে ইম্ফলে পশ্চিমাধারার লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, ডন বাসকো হাই

কাংলাশা

কাংলা মন্দির

স্কুল, সেন্ট যোসেফ'স কনভেন্ট ও নির্মলাবাস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে পার্বত্য জেলাগলিতে খ্রিস্টধর্ম ও শিক্ষার প্রসার ঘটে।

রাজ্যের প্রায় ৮ শতাংশ মানুষ লোকধর্মের অনুসারী। সনমাহি বাদীরা সূর্যের পূজারী। প্রাচীন মণিপুরীদের প্রধান দেবতার নাম লাইনিংঠৌ সোরালেল। তারা ছিল প্রকৃতিবাদী। মণিপুরীদের পূজিত কয়েকটি ঐতিহ্যবাদী দেবতার নাম আতিয় সিদাবা, পাখাংবা, সনমাহি, লেইমারেন, ওকনারেল, পাঙ্গাম্বা, থাংজিং, মার্জিং ওয়াংবারেন ও কৌব্রু।

মণিপুরী মুসলমানদের স্থানীয়ভাবে মেইতেই পাঙ্গাল বলা হয়। সুফী সাধক শেখ শাহজালাল দিন আল-মুজারাদ আল-তুর্ক আল-নকসবন্দী সিলেটে এবং হযরত আযান ফকির বাগদাদী ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম প্রচারে আসামে আসেন। এরা হানাফিধারার সুন্নী মুসলমান। মেইতেই মুসলমানদের মধ্যে আরব, বাংলাদেশ, তুরানি, বাঙালি এবং মুঘল বা চাংতাই তুর্ক গোষ্ঠী রয়েছে।

মণিপুরে সাক্ষরতার হার ৬৮.৮৭ শতাংশ। মুসলমানদের সাক্ষরতার হার ৫৮.৬ শতাংশ (পুরুষ ৭৫ শতাংশ, নারী ৪১.৬ শতাংশ)।

ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই মণিপুরে জনবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মেইতেই, নাগা, কুকি ও অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস তীব্র এবং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে স্বাধীন অস্তিত্বের জন্য লড়াইয়ে নিয়োজিত।

অর্থনীতি

২০১২-১৩ অর্থবছরে মণিপুর রাজ্যের গড় দেশজ উৎপাদন ছিল ১০ হাজার ১৮৮ কোটি রুপি (দেড়শো কোটি ডলার)। এর অর্থনীতি প্রধানত কৃষি, বন, কুটির ও বাণিজ্যনির্ভর।

মণিপুরকে ভারতের 'পুবের দরজা' বলা হয়। মোরেহ্ ও তামু শহরের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বর্মা ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের স্থল সংযোগ বিদ্যমান।

মণিপুর হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় মণিপুরেই সর্বোচ্চ হস্তশিল্পীর বাস।

মণিপুর বিদ্যুৎ অবকাঠামো থেকে ২০১০ সালে প্রায় ০.১ গিগাওয়াট-ঘণ্টা (০.৩৬ টিজে) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। রাজ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভাবনা ২ গিগাওয়াট-ঘণ্টা। এর যদি অর্ধেকও উৎপাদিত হয়, তাহলে মণিপুরের প্রত্যেকটি বাসিন্দা ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সুবিধা পাবেন এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি ও বর্মা বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে।

মণিপুরের জলবায়ু ও মাটি উদ্যান-ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী। ঔষধ ও সুগন্ধি বৃক্ষের চাষ ক্রমবর্ধমান। অর্থকরী ফসলের মধ্যে লিচু, কাজু বাদাম, ওয়ালনাট, কমলা, লেবু, আনারস, পেঁপে, প্যাশন ফল, পিচ, নাসপতি ও পাম উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে ৩ হাজার বর্গকিমি-র অধিক এলাকাজুড়ে বাঁশ বাগান। ফলে এটি ভারতের সর্ববৃহৎ বাঁশ শিল্প এলাকা।

যাতায়াত অবকাঠামো

ইম্ফলে চ্যাঙ্গানগেইয়ের টুলিহাল বিমানবন্দর মণিপুরের একমাত্র বিমান বন্দর। এটি সরাসরি দিল্লি, কলকাতা, গৌহাটি ও আগরতলার সঙ্গে যুক্ত। এটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে মানোন্নীত করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমানবন্দর হিসেবে এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। জাতীয় মহাসড়ক এনএইচ ৩৯ মণিপুরকে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর রেল স্টেশনের মাধ্যমে বাকি ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ইম্ফল থেকে এর দূরত্ব ২১৫ কিমি। জাতীয় মহাসড়ক ৫৩ মণিপুরকে আসামের শিলচর রেল স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করেছে, ইম্ফল থেকে এর দূরত্ব ২৬১ কিমি। মণিপুরের ৭ হাজার ১৭০ কিমি দৈর্ঘ্যের সড়কপথ সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর ও দূরের গ্রামকে সংযুক্ত করেছে। ২০১০ সালে ভারত সরকার মণিপুর থেকে ভিয়েতনামে পর্যন্ত এশীয় অবকাঠামো নেটওয়ার্ক তৈরির চিন্তাভাবনা করছেন। প্রস্তাবিত ট্রান্স এশীয় রেলপথ নির্মিত হলে এটি মণিপুর দিয়ে ভারতকে বর্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত করবে।

পর্যটন

মণিপুরের পর্যটন মৌসুম অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সময়টা রৌদ্রকরোজ্জ্বল অথচ তত গরম ও আর্দ্র নয়। মণিপুরের মার্শাল আর্ট, নাচ, থিয়েটার ও ভাস্কর্য বিখ্যাত। সবুজের সঙ্গে সহনীয় আবহাওয়া। উখরুল (জেলা)-এর মৌসুমি শিরুই লিলি, সেনাপতির জুকৌ উপত্যকা, সাঙ্গাই (ব্রো এন্টলরেড ডিয়ার) হরিণ, লোকতাক হ্রদের ভাসমান দ্বীপ মণিপুরের বিরল দর্শন দ্রষ্টব্য। রাজকীয় খেলা পোলোর উৎপত্তি মণিপুরেই।

রাজধানী ইম্ফল পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত। জাতীয় খেলাধূলার জন্য ১৯৯৭ সালে খুনাম লাম্পাক ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মিত হয়। একে কেন্দ্র করে পাওনা বাজার, গম্ভীর সিং শপিং কমপ্লেক্স, নিংথিবি কালেকশনস ও লেইমা প্লাজা গড়ে উঠেছে।

শ্রী গোবিন্দজী মন্দির, এ্যান্ড্রো ভিলেজ ও মণিপুর রাজ্য জাদুঘর ইম্ফলে অবস্থিত।

হ্রদ ও দ্বীপ

ইম্ফল থেকে ৪৮ কিমি দূরে অবস্থিত লোকতাক হ্রদ উত্তর-পূর্ব ভারতের

ঐতিহ্যবাহী পোলো খেলা

কোরাস মন্দির

কাংলা ফটক

বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ-সাগর। সেন্দ্রা দ্বীপে একটি পর্যটক বাংলো রয়েছে। ছোট ছোট দ্বীপ, ভাসমান আগাছা, এসব খেয়ে বেঁচে থাকা হ্রদের মানুষজন, হ্রদের নীল জল ও রঙিন জলজ গাছপালা দর্শনীয়। সেন্দ্রার বাংলোয় একটি ক্যাফেটেরিয়া আছে। জলজ আগাছা ও অন্যান্য গাছপালার স্তূপ দিয়ে এসব ভাসমান দ্বীপ তৈরি হয়েছে। হ্রদের জলে অনেক প্রজাতির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণি পাওয়া যায়। এটি বিষ্ণুপুর জেলায় অবস্থিত। লোকতাকের শাব্দিক অর্থ লোক = ছোট নদী, তাক = শেষ অর্থাৎ ছোট নদীর শেষ প্রান্ত। সেন্দ্রা পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত সেন্দ্রা পার্ক ও রিসোর্ট পর্যটক আকর্ষণ কেন্দ্র।

পাহাড় ও উপত্যকা

কাইনা টিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯২০ মিটার (৩ হাজার ২২ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত মণিপুরী হিন্দুদের পবিত্র স্থান। জনশ্রুতি আছে, ভক্তিমান শ্রী জয়সিং মহারাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শ্রী গোবিন্দজী তাঁর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। এটি ইম্ফল থেকে ২৯ কিমি দূরে অবস্থিত।

কোহিমার সীমান্তবর্তী সেনাপতি জেলার জুকৌ উপত্যকা মৌসুমি ফুল প্রাণি ও উদ্ভিদের মেলা। জুকৌ শব্দটি এসেছে আঙ্গামি/মাও ভাষা থেকে যার অর্থ 'ঠাণ্ডা জল'। এটি সমুদ্রতল থেকে ২ হাজার ৪৩৮ মিটার (৭ হাজর ৯৯৯ ফুট) উঁচু উপত্যকায় প্রবাহিত ঠাণ্ডা জলের নদী। এখানে পাওয়া যায় উপত্যকার একমাত্র জুকৌ লিলি।

প্রতিবেশ পর্যটন

ইম্ফল থেকে ৪৮ কিমি দূরে অবস্থিত কেইবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান বিরল ও বিপন্ন ব্রো এন্টলরেড হরিণের বাসভূমি। এখানে ১৭ প্রজাতির বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণি রয়েছে। এটি পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান। ইম্ফলের ৬ কিমি পশ্চিমে ইম্ফল-কাঙ্চুপ সড়কের পাশে ইরোইসেম্বা টিলায় অবস্থিত জুলজিক্যাল গার্ডেনে কিছু ব্রো এন্টলরেড হরিণ (সাঙ্গাই) রয়েছে।

জলপ্রপাত

ইম্ফল থেকে ২৭ কিমি দূরে সেনাপতি জেলাসদরের পার্বত্য এলাকায় ইচুম কেইরাপ গ্রামে অবস্থিত সাদু চিরু জলপ্রপাতে ৩০ মিটার (৯৮ ফুট) উপরের ৩টি পাহাড় থেকে জল আছড়ে পড়ে। এর কাছেই আছে আগাপে পার্ক। ইচুপ কেইরাপ গ্রামের কামলুম টেলিয়েন এটির মালিক ও ব্যবস্থাপক।

প্রাকৃতিক গুহা

রাজধানী থেকে প্রায় ১৮৫ কিমি (১১৫ মাইল) ও টামেংলং জেলা সদর দফতরের ৩০ কিমি (১৯ মাইল) উত্তরে মণিপুরের একমাত্র ঐতিহাসিক স্থান ঠালোন গুহা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯১০ মিটার (২ হাজার ৯৯০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। ঠালোন গ্রাম থেকে এই গুহার দূরত্ব ৪–৫ কিলোমিটার দূরে।

উখরুল জেলায় অবস্থিত খাংখুই গুহা একটি প্রাকৃতিক চুনাপাথরের গুহা। জনশ্রুতি আছে, গুহার বড় কক্ষটি ভেতরে বসবাসকারী দানবরাজের দরবার কক্ষ, উত্তরের কক্ষটি তার শয়ন কক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রামবাসীরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। খাংকুই গ্রাম থেকে এ গিরিগুহায় উঠতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে।

শিক্ষা

মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মণিপুর জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট মণিপুরের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজ্য, কেন্দ্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলো পরিচালনা করে থাকে।

সংস্কৃতি

মণিপুরে দু'ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হয়। শুমাং লীলা অনেকটা যাত্রার ঢঙে গৃহের আঙিনায় মঞ্চস্থ হয়। এটাকে বলে গণ থিয়েটার। ফাম্পাক লীলা পশ্চিমা থিয়েটার ও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র মডেলের। স্যার চুরচাঁদ মহারাজ (১৮৯১–১৯৪১)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০২ সালে প্রভাস মিলন অভিনয়ের মাধ্যমে তথাকথিত আধুনিক মণিপুরী থিয়েটারের সূত্রপাত। ১৯৩০ সালে মণিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এখানে থিয়েটার আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলশ্রুতি আর্য থিয়েটার (১৯৩৫), চিত্রাঙ্গদা নাট্য মন্দির (১৯৩৬), সোসাইটি থিয়েটার (১৯৩৭), রূপমহল (১৯৪২), কসমোপলিটান ড্রামাটিক ইউনিয়ন (১৯৬৮), এবং রতন ঠিয়ামের কোরাস রিপারটরি থিয়েটার (১৯৭৬)। এসব গ্রুপ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনির বাইরেও পরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চস্থ করে। শুমাং ও ফাম্পাক উভয় নাট্যধারাই নতুন দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার বার্ষিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

ভক্তিশ্বর দামোদর স্বামীর নেতৃত্বে ইসকন উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৯৮৯ সালে বৈষ্ণবধারার 'রঙ্গনিকেতন মণিপুরী সাংস্কৃতিক আর্টস ট্রুপ' প্রতিষ্ঠা করে। রঙ্গনিকেতন বিশ্বের ১৫টি দেশের ৩শো স্থানে প্রায় ৬শো নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

মণিপুরী নাচ

জাগোই নামে পরিচিত মণিপুরী নাচ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার অন্যতম প্রধান ধারা। হিন্দু বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করে

উৎরা সাংলেন– কাংলা প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে কাংলা ড্রাগন

লেকতাক হ্রদ

লেইমার জলপ্রপাত

রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া শৈব, শাক্ত এবং আঞ্চলিক দেবতা উমাং লাইয়ের লীলাকেন্দ্রিক নাটকও মঞ্চস্থ হয়। মণিপুরী নাচ সকল ভারতীয় শাস্ত্রীয় নাচের মত প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃত গ্রন্থ *নাট্যশাস্ত্র* থেকে উদ্ভূত, তবে ভারতীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতিও এতে মিশেছে।

কোরাস রিপারটরি থিয়েটার

ইম্ফলের উপান্তে কোরাস রিপারটরি থিয়েটার অডিটোরিয়াম প্রায় ২ একর জমির ওপর অবস্থিত। এদের চক্রব্যুহ ও উত্তরপ্রিয়দশী আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত নাটক। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর চক্রব্যুহ ভেদ সংক্রান্ত আখ্যানের ওপর রচিত নাটকটি ১৯৮৭ সালে এডিনবার্গ আন্তর্জাতিক থিয়েটার উৎসবে ফ্রিঞ্জ ফার্স্টস এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। অপরদিকে উত্তরপ্রিয়দশী সম্রাট অশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তরের ৮০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস উপস্থাপনা।

খেলাধূলা

মণিপুরের কিছু নিজস্ব খেলা রয়েছে। মুকনা হচ্ছে এক ধরনের জনপ্রিয় কুস্তি। মুকনা ক্যাংজেই হচ্ছে আরেকধরনের কুস্তি হকি এবং ক্যাংজেই (বেতের লাঠি) বাঁশের মূল দিয়ে তৈরি বল খেলা।

যুবি লাকপি মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী নারকেল কেড়ে নেয়ার খেলা, যার সঙ্গে রাগবির সাদৃশ্য রয়েছে। উলাওবি হচ্ছে মেয়েদের আউটডোর খেলা। মেয়েরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল আরেকদলকে আক্রমণ করে।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনির ক্যাপ্টেন রবার্ট স্টুয়ার্ট এবং লেফটেন্যান্ট যোসেফ শেরের ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় পুলু বা সাগল কাংজেই (ঘোড়া ও লাঠি) খেলাটি দেখে নিজেদের মধ্যে কলকাতায় খেলাটি প্রবর্তন করেন। নাম দেন পোলো। পরে এটি ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

এছাড়াও শিশুদের কিছু আউটডোর খেলা যেমন, খুটলোকপি, ফিবুল ঠোম্বা ও চাফু ঠুংগাইবি স্থানীয়ভাবে শুধু নয়, বিদেশেও জনপ্রিয় হয়েছে। কম্বোডিয়ার শিশুরা খ্মের নববর্ষে এসব খেলায় অংশ নেয়।

উৎসব

মণিপুরের উৎসবগুলি হচ্ছে লুই-ন্গাই-নি নিঙ্গোল চকৌবা, যাওশাং, গান-ন্গাই, চুম্ফা, চেইরাওবা, ক্যাং ও হেইক্রু হিডোংবা। এ ছাড়াও আছে মুসলমানদের ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস।

নিঙ্গোল চকৌবা নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় মণিপুরের মেইতেই ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সামাজিক উৎসব যেখানে বিবাহিত মেয়েরা (নিঙ্গোল) তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে ভোজের নিমন্ত্রণে আসে। উন্নত খাবার ছাড়াও মেয়ে ও তার ছেলেমেয়েদের উপহার দেওয়া হয়। বাবার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার ও বন্ধন বাড়ানো এ উৎসবের লক্ষ্য।

কুট নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ফসল কাটার পরে মণিপুরের কুকি-চিন-মিজো উপজাতীয়দের অন্যতম বড় উৎসব। কুট কোন সম্প্রদায় বা উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়– গোটা রাজ্য উৎসবে মেতে ওঠে। এ উৎসবের সময় ঐতিহ্যবাহী নাচ, লোকনৃত্য গানবাজনা, খেলাধূলা এবং 'মিস কুট প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করা হয়।

যাওসাং ফেব্রুয়ারি বা মার্চে অনুষ্ঠেয় মণিপুরের বৃহত্তম উৎসব।

খুয়াওডো পাওমি টেডিম আমজনতার ফসল কাটার উৎসব, টেডিমরা ভারত ও মায়ানমারে সুকতে ও জোমি নামে পরিচিত। প্রতিবছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চেইরাওরা বসন্ত ঋতুতে মণিপুরের নতুন বছর উদ্‌যাপনের উৎসব। এদিন মানুষ ভোজ খেয়ে একসঙ্গে পাহাড়ে চড়ে। এর তাৎপর্য হচ্ছে সব বাধা ডিঙিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছনো। এটি মার্চ বা এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব সাজিবুগি নোংমা পানবা নামেও পরিচিত।

গান-ন্গাই জেলিয়াংরং জনগণের সবচেয়ে বড় উৎসব। মেইতেই বর্ষপঞ্জির ওয়াকচিং মাসের ত্রয়োদশ দিনে এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

সূত্র উইকিপিডিয়া
অনুবাদ মানসী চৌধুরী

জুকৌ উপত্যকা

জুকৌ লিলি

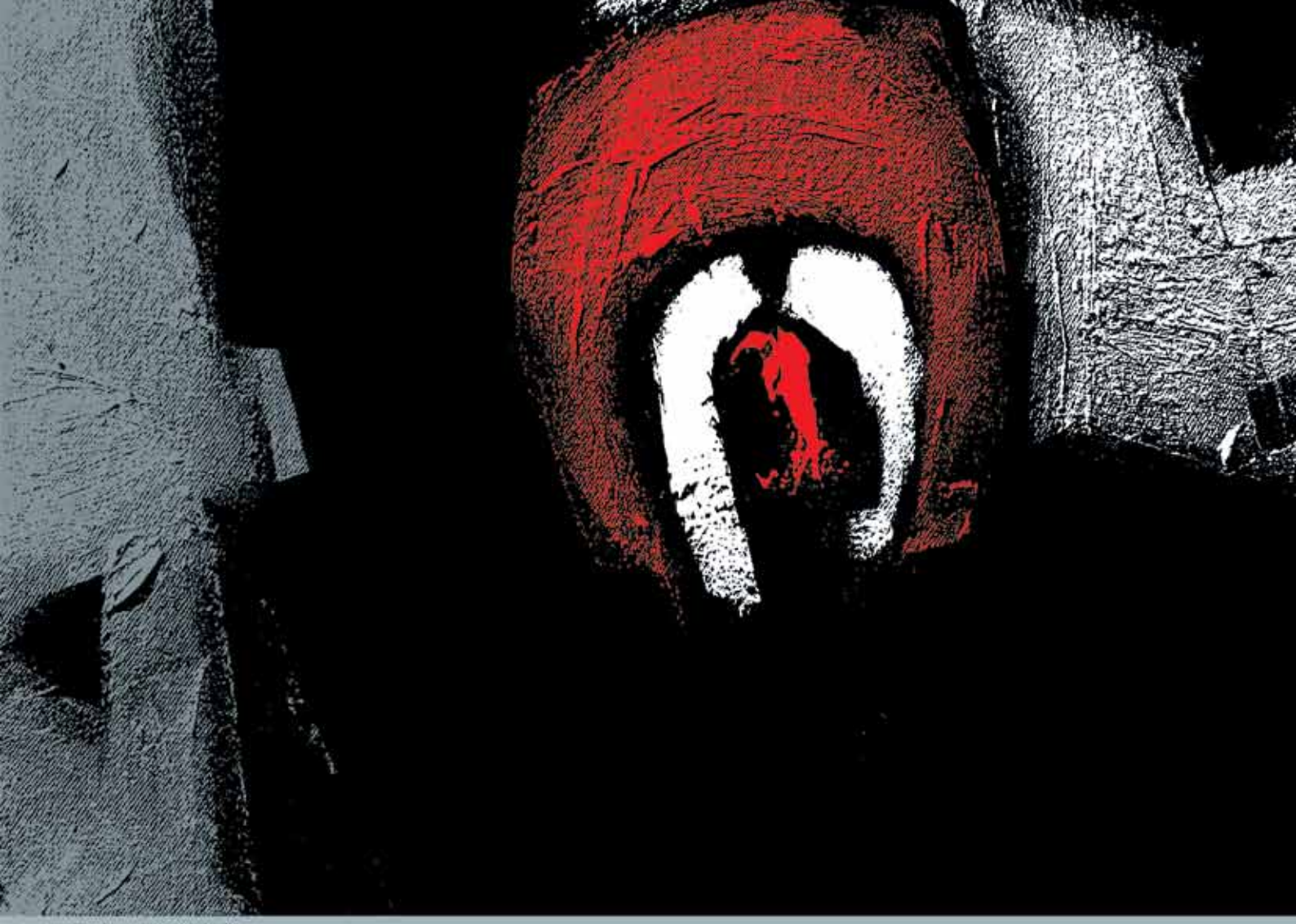

ছোটগল্প

কক্ষচ্যুত

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের দেওয়ালময় দাদার পছন্দের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি ইন্দ্রজিতের নায়করা– ব্রুসলি, জ্যাকি চ্যাং, অক্ষয়কুমার। এই তিনজন তারকার চটকদার অনাচ্ছাদিত সিক্সপ্যাক সমৃদ্ধ পোস্টারের পাশে এখন জুড়েছে আরও কয়েকজনের মলিন ছবি– মাসুতাৎসু ওয়্যামা, হিদেয়েৎসু আশিয়ারা পত্রিকার পাতা কাটা কাগজের ঝাপসা ছবিতে মুখ চেনার উপায় নেই, শুধু পোশাক জানান দিচ্ছে তারা মার্শাল আর্টিস্ট। জ্যাকি চ্যাং-এর মত কমেডি বা ব্রুসলির মত তাক লাগানো হলিউডি অ্যাকশন হিরো নয়, অক্ষয়কুমারের মত নাচিয়ে ঝাড়পিট করা বলিউড তারকাও নয়। এরা ক্যারাটের একেকটি ঘরানার নির্মাতা। অবশ্য জিৎকোন্ডোর মত ক্যারাটে আর তাইকোন্ডোর মিশেল দেওয়া লড়াকু শিল্পের জনক হিসেবে ব্রুসলিরও একটা বাড়তি সমীহ প্রাপ্য। ইন্দ্রজিৎ অতশত না বুঝে অক্ষয়, ব্রুসলিদের দেখেই ক্যারাটেতে ঝুঁকেছিল। মার্শাল আর্ট কথাটার সঙ্গেও তখন পরিচয় ঘটেনি। দত্তপুকুরে তাদের বাড়ির কাছে যে সম্মিলনী ক্লাব, সেখানে সাদা ঢোলা পোশাক আর কোমরে বাঁধা বেল্ট নিয়ে ছেলেদের ইয়া ইয়া করে হাত পা ছুঁড়তে দেখে তারও শখ তীব্র হয়। মা-বাবার কাছে আবদার করে ঢুকেও পড়ে।

পরের দিন ইন্দ্রজিতের নবলব্ধ জেনারেল নলেজের ভাণ্ডার দেখে আকৃষ্ট হয়ে সম্মিলনী ক্লাবের আরও কিছু ছেলে বিনোদদার বাড়িতে হানা দেয়। বিনোদদার উঠোনে অতজনের জায়গা হবে না। তিনি বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশের মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন। দক্ষিণার কথা জানতে চাইলে হাসতেন, "আগে মাসখানেক দেখি–" বস্তুত একমাসের আগেই ইন্দ্রজিৎ আর সুজয় ছাড়া বাকিরা কেটে পড়েছিল।

একদিন এক বেঁটে গাট্টাগোট্টা মাঝবয়সী পুরুষকে তাদের অনুশীলন দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসতে দেখে। মন্তব্য কানে আসে, "বেসিক স্টান্সগুলো না শিখেই কিক্, আপার ব্লক, লোয়ার ব্লক? বেশ বেশ। এসবই তো চলছে এখন। কারই বা জ্ঞান আছে আসল জিনিস শেখাবার আর ক'জনেরই বা ধৈর্য আছে শেখবার? কয়েক বছরের মধ্যেই তো সব ব্রাউন বেল্ট, ব্ল্যাক বেল্ট পেয়ে যাবে সিলেবাস কমপ্লিট করে।" ইন্দ্রজিৎ সেদিন থেকে পিছু নিয়েছিল ব্রহ্মদেশ থেকে আসা এই একটেরে লোকটার। আসল জিনিস শিখবে। ভদ্রলোকের ছাত্র পেটানোর মোহ নেই। খেদিয়েই দিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎকে আজকালকার নিষ্ঠাহীন ফাঁকিবাজ ওপরচালাক ছোকরার দলে ফেলে। ইন্দ্রজিৎও একদিন বলে ফেলল, "শেখানোর মুরোদ নেই যখন, অন্যের তালিমকে হ্যাটা দেওয়া কেন? শুভ্রাংশু স্যাররা তো কিছু দিচ্ছে আমাদের মত ফালতু ছেলে-ছোকরাদের। আপনি ক'জনকে তৈরি করেছেন?"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, "বেশ কাল ভোর পাঁচটায় এস। স্কুল ক'টা থেকে? দেখি তোমার কত এলেম, কত নিষ্ঠা।" ওঁর কাছ থকেই শোনা মাসুতাৎসু হলেন কায়োকুশিন ধারার প্রবর্তক। অত্যন্ত আক্রমণাত্মক এই শৈলীটি ক্রীড়ামঞ্চে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বজুড়ে শোটোকান ও গোজুকান-এরই রমরমা। হিদেয়ুকো আশিয়ারা কায়োকুশিনকে একটু নরম ধাঁচে ফেলে নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেন– কায়োকুশিন আশিয়ারা। বিনোদ শেঠ ব্রহ্মদেশে থাকাকালে এই শৈলীটিই সামান্য একটু শিখেছিলেন।

পরের দিন ইন্দ্রজিতের নবলব্ধ জেনারেল নলেজের ভাণ্ডার দেখে আকৃষ্ট হয়ে সম্মিলনী ক্লাবের আরও কিছু ছেলে বিনোদদার বাড়িতে হানা দেয়। বিনোদদার উঠোনে অতজনের জায়গা হবে না। তিনি বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশের মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন। দক্ষিণার কথা জানতে চাইলে হাসতেন, "আগে মাসখানেক দেখি–" বস্তুত একমাসের আগেই ইন্দ্রজিৎ আর সুজয় ছাড়া বাকিরা কেটে পড়েছিল। তারা আবার নাকে খত দিয়ে সম্মিলনীতে। অনেক ত্যারছা মন্তব্য হজম করতে হয়েছিল তাদের, "দেখি আসল জিনিস কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস তোরা? শার্টের না প্যান্টের পকেটে, নাকি জাঙিয়ার বুক পকেটে?"

বিনোদদা শুরু করেছিলেন দাচি বা স্টান্স দিয়ে। কিবাদাচি বা ঘোড়সোয়ারের ভঙ্গি, হাংগেৎসু দাচি বা সামনে ঝোঁকার কায়দা, কোকুৎসু দাচি বা পেছনে ঝুঁকে দাঁড়ানোর কৌশল, সানচিং দাচি বা থ্রি পয়েন্ট স্টান্স, কুমিতে দাচি বা রণপ্রস্তুতি এইসব। দু'পায়ের নানারকম অস্বাচ্ছন্দ্যকর ভঙ্গি ও হাতকে বিশেষ অবস্থানে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা। শুরুর কিবা দাচি অনেকটা ভরতনাট্যমের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। প্রথমটায় উৎকটাসনের মত সহজ মনে হলেও যখন ঐ স্টান্সে পনেরো মিনিট দাঁড়াতে বলা হত, বেশির ভাগই "উঃ আঃ" করে সাত আট মিনিটের মাথায় উঠে দাঁড়াত। সময়টা বাড়তে থাকলে ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকল। কেউই হাংগেৎসু দাচির পর টিঁকে থাকেনি। ইন্দ্রজিৎ আর সুজয়কে যখন কোনও স্টান্সে এক ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে দিতেন বিনোদদা, প্রবল যন্ত্রণাবোধটা যখন ক্রমশ অস্তিত্ব অসাড় করে দিত, তখন ইন্দ্রজিতের সংশয় হোত, লোকটা সত্যিই কিছু শেখাতে চায় তো! কিন্তু কষ্ট সহ্য করার অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মাসখানেক পর স্নানের সময় নিজের উরু আর গুলির পেশির দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নার্সিসাসের মত নিজেকে আয়নায় দেখে যেত। মুখখানা তো তার মারকাটারি ছিলই কিন্তু শরীর ডিগডিগে, হাত-পা টিংটিঙে। ঐ সুগঠিত পাদুটো ইন্দ্রজিৎ পুরকায়স্থেরই তো? শুধু দাঁড়াতে শিখেই এই? তাহলে হাত-পা ছুঁড়ে অক্ষয়মার্কা চেহারা পেতে কত দিন?

সুজয়ের চেহারা বরাবরই দোহারা। তার গায়ের জোর, ঘুসির পরিধি অনেক বেশি। তবু ইন্দ্রজিৎ ওর সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে যেত। ওর সম্পদ ছিল নমনীয়তা, গতি আর অ্যাকিউরেসি যাকে বাংলা করে ত্রুটিহীনতা বললে বাড়াবাড়ি শোনাতে পারে। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন কেই-বা হতে পারে? বছরতিনেক পর সুজয় গেল অন্য গুরুর কাছে। বিনোদদার শিক্ষানবিশি যত উচ্চাঙ্গেরই হোক, তিন বছরেও একটা ন্যূনতম 'ইয়েলো বেল্ট'-ও দিতে পারল না। কোনও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় যে! ও দিকে, গৌরাঙ্গরা লম্ফঝম্প করে ব্রাউন বেল্ট থেকে এখন ব্ল্যাক বেল্টের দাবিদার। সম্মিলনী নয়, সুজয় গেল কলকাতার এক নামকরা প্রতিষ্ঠানে। তারা শোটোকান শৈলী শেখায়। তা হোক। সুজয়ের অসুবিধা হল না। বছর দুয়েকের মধ্যে সে-ই নতুন বাচ্চাদের তালিম দেওয়ার কাজ পেয়ে গেল। ক্যারাটেকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছে সে। মাধ্যমিকে ভাল ফলের অভিলাষ নেই, উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায় না, তার পরে না পড়লেও চলে।

সুজয় বন্ধুকে লুকিয়ে চলে যায়নি। সঙ্গে নিতেই চেয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রজিতের পড়াশুনোয় ভাল হিসেবে মাধ্যমিকে স্টার পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, উচ্চমাধ্যমিকের পর জয়েন্ট ইত্যাদির পরিকল্পনা ছিল। স্কুল টিউটোরিয়াল করে বাড়ির কাছে বিনোদদার আখড়াটা চালানো যায়, কলকাতায় দৌড়ে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিনোদদাকে ভালওবেসে ফেলেছিল। ইন্দ্রজিতের বাবা এসে মাসতিনেক বিনে পয়সায় শিক্ষার পর খামে ভরে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ছেলের হাতেও মাসের শুরুতে খাম পাঠিয়ে দিতেন। সুজয়কেও লজ্জায় পড়ে গুরুদক্ষিণা চালু করতে হয়েছিল। কিন্তু এমন নির্লোভ আপনভোলা গুরু আজকের যুগে কেন, ত্রেতা যুগেও কেউ ছিল কিনা কে জানে? অন্তত দাপরে যে ছিল না, তার প্রমাণ দ্রোণাচার্য, পরশুরামরা রেখে গেছেন। গুরুগৃহে শ্লোক মুখস্থ ও পেটভাতার বিনিময়ে বৈদিক যুগের ছাত্রদের গুরুর গরু চরানো, খেত চষা, বাড়ির কাজ সবই করতে হত। সে অন্যত্র গেল না।

কিন্তু বিনোদদা বিনা নোটিসে বেমক্কা হার্টফেল করে চলে গেলেন। অমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কোনও মন্দ দোষ বা নেশা-ভাঙও ছিল না। হিসাব মিলছিল না। অনাত্মীয় মানুষটা কেন বার্মা ছেড়ে এই দত্তপুকুরে জমি কিনে বসবাস শুরু করেছিলেন সেটাও অজানা থেকে গেল। উনি মারা যাওয়ার পর কোন এক দূর-সম্পর্কের ভাইপো নিজেকে একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী প্রমাণ করে ঐ বাড়িতে সপরিবারে প্রতিষ্ঠিত। বাড়ির উঠোনে এখন দড়িতে শাড়ি, জামা, কাঁথা ঝোলে এক গাদা। সম্মিলনীতে ফিরে যাওয়ার মুখ নেই। ক্যারাটে তার এই পর্যন্তই ভাগ্যে ছিল।

আজকাল জয়েন্টের সিট অনেক বাড়ানো হয়েছে। নব্বই দশকের গোড়াতেও মেডিকেলের আসন ছিল হাজারের কম, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বারোশোর মত। এখন নাকি বসলেই পাওয়া যায় প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রমরমায়। বাবার ইচ্ছে কারিগরী, নিজের আয়ত্বে

জীবনবিজ্ঞান। দুটোতেই বসেছিল। মেদিনীপুরের একটা কলেজে অ্যাডমিশন হয়েও যেত। কিন্তু বাবা শিবপুর, যাদবপুর বা বড় জোর উত্তরবঙ্গের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়া প্রাইভেট কলেজগুলোতে পড়ে কিছু শেখা যায় বলে মানতেই নারাজ। হয়তো খরচায় কুলোলে মত বদলাতেন। মা বলেছিলেন, "পলিটেকনিক দে"। বাবা নাক সিটকে বলেন, "কোথায় বি ই আর কোথায় পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ার? যে ডাক্তার হওয়ার যোগ্য, তাকে বলছ আয়া হয়ে থাক। অশিক্ষিত মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কাকে বলে? দরকার হলে ফিজিক্স নিয়ে জেনারেল পড়বে।"

"কেন তোমার বন্ধু তিমিরবাবু পলিটেকনিক পাস করেই তো কোম্পানির অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিটায়ার করবে। আমি যেটা সহজে হবে আর ও পারবে সেটা বলেছি। মুখ্যু মানুষের খোঁটা তো নতুন নয়। তুমি ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে টেকনিক্যাল অফিসার.."

"যা বোঝ না, তাই নিয়ে কথা বোল না। অফিসে আমার কাছে এখনও সবাই আসে যে কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা নিয়ে, এমনকি যে কোনও ক্রিটিক্যাল চিঠি ড্রাফট্ করাতে হলেও অবিনাশ পুরকায়েত। এত বছর কাজ দেখিয়ে–। আমার দুর্বল জায়গায় একদম ঘা দেবে না। আদর্শ স্ত্রী হওয়ার শিক্ষাই পাওনি, আর ছেলের পড়াশুনো নিয়ে ফোড়ন কাটতে এসেছ..."

দাদা বাবাকে কিছু বলতে সাহস পায় না। মায়ের ওপরই বিরক্তি প্রকাশ করে। সে নিজের জেদে এম কম করে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরি করে। ইন্দ্রজিতের এখনও পড়াশুনোই শেষ হয়নি। তবু দাদা অরবিন্দের ভাষায় সে বেকার। ছোট ভাইয়ের কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা হতে একদিন মন্তব্য করল, "মা, বাবার কিন্তু বেশি দিন চাকরি নেই। ভস্মে ঘি ঢালার পর নিজেদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা যাতে থাকে সেটা দেখো।"

সারাজীবন সবার জন্য এত করে নিজের ছেলেকে কি কোনও নৈতিকতা শেখাতে পারেননি অবিনাশ?

বুড়ো মানে অরবিন্দ নিজের বাবাকে দেখেনি কীভাবে ঠাকুমা-দাদু -তিন কাকা-তিন পিসির অত বড় সংসার টেনেছেন? বাড়িতে এসোজন বোসজন লেগেই থাকত। মা অভুক্ত থাকলেও কোনও দিন অভিযোগ করেননি। এখনও দুপুরে এলে কেউ না খেয়ে যেতে পারে না। সেই বাপ-মার ছেলে হয়ে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের দায়িত্ব এড়িয়ে হিংসা? ছোটনের তো এখনও দায়িত্ব নেওয়ার সময় শুরুই হয়নি। এখনও এই সংসার বাপের টাকায় চলে। রোজগেরে ছেলে খেয়ালখুশিমত এটা সেটা শখের জিনিস কিনে নিজের ঘর সাজায়। সংসারে দেওয়ার মধ্যে পুরনো ফ্রিজ বদলে একটা দুই দরজার ফ্রিজ কিনেছে। সেটাতেও সদা সতর্ক। যেন সে ছাড়া আর কেউ রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করতে জানে না, নষ্ট করে ফেলবে। ছোটনের মত শান্ত ও বাধ্য ভাই, যে বাবা-দাদার ফরমাসে দিনে শতবার দোকান হাট ইলেকট্রিক অফিস, গ্যাসের দোকানে দৌড়চ্ছে, এমনকি পরীক্ষার আগেও মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটায় না, তার প্রতি কেন এত বিদ্বেষ? ছোট ছেলেটার মুখচোখ মায়ের আদলে বেশ চোখা চোখা, বাবার মত মাঠো মাঠো গায়ের রং। বুড়োর মাথা আর গায়ের রং দুটোই টকটকে পরিস্কার; শুধু মনটাই সাফ হয়নি।... কাঁধে ব্যথা নিয়ে ইন্দ্রজিৎ দাদার ঝাঁজের কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারে।

বছরদেড়েক আগের কথা। কস্তুরী সল্টলেকের একটা কল সেন্টারে চাকরি করে। শিফ্ট ডিউটি। কখনও ভোরে উঠে দৌড়তে হয়, কখনও দুপুরে আবার কখনও সময় রাত্রি আটটায় অফিসের বাস ধরার জন্য এই মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ায়। আফিস ফেরতা তাকে প্রায় রোজই দেখত অরবিন্দ। এক রবিবার বাজারে দেখা হওয়াতে দু'জনই দু'জনকে দেখে হেসেছিল, "বাজার করতে?"

কস্তুরীর নাইট শিফ্ট না থাকলে নিয়মিত দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই ছোটভাই নিয়ম করে বাজার করলেও রবিবার অরবিন্দ একবার বাজারে চক্কর দিয়ে যায়। রবিবার সকাল আটটা নাগাদ যেতে পারলে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সবজিপাতি, মাছ-মাংস কী লাগবে জানা না থাকায় খানদশেক মিষ্টি কিনে বাড়ি ফেরে। কস্তুরীকে দেখতে পেলে খানিক গল্পগুজব আর প্রশ্ন "নাইট শিফ্ট কবে থেকে?"

আমেরিকান শিফ্ট থাকলে কস্তুরী আজকাল একটু আগেভাগেই অফিসের বাসের জন্য মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করতে থাকে। আর অরবিন্দ স্টেশনে নেমে একটু দেরিতে বাড়ি ঢোকে।

"রবিবার দিন বাজার ছাড়া আর কোথাও দেখা করা যায় না?"

"এই তো দেখা হচ্ছে।" হেসেছিল কস্তুরী।

অতঃপর দু'জনেরই বাজারের ঘটা বেড়ে যায়। রোজগেরে ছেলে শুধু মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরলে ভাল দেখায় না। তাই মাছ, মাংস, পনির, গোলদারি যেসব দোকানে কস্তুরী লাইন দেয়, অরবিন্দকেও সেখানে সেখানে হাজিরা দিতে গিয়ে এটা সেটা কিনতেও হয় মাঝে মধ্যে। যদিও জানিয়ে দেয়, সংসার খরচ বাবদ মা আর বাজার বাবদ ছোটভাইকে টাকা দেওয়াই আছে। কস্তুরীর একটাই উত্তর, মৃদু হাসি।

ফেরার পথে একটা চায়ের দোকানে খানিকক্ষণ বসা। দু'জনেই বাড়ি গিয়ে মায়ের হাতে বানানো চা খেতেই পছন্দ করে। তবু। চায়ের দোকানে বসার প্রস্তাব অরবিন্দের হলেও তার খুচরোর অভাবে দাম বেশির ভাগ কস্তুরীই মেটায়। সঙ্গের হাসিটা ফাও।

সেদিনও চা খেতেই ঢুকেছিল। দোকানটায় বড্ড বেশি ভিড় ছিল ঐ দিন। একদল টি-শার্ট পরা ছোকরা উচ্চ কণ্ঠে গুলতানি করছিল। কস্তুরী বলল, "আজ থাক। এত ভিড়ের মধ্যে–। চেয়ারও তো ফাঁকা দেখছি না।"

"কেন, এই তো জায়গা ফাঁকা ওদিকে। সব সময় কি অধৈর্য হলে চলে? ফাইভস্টার হোটেলেও অনেক সময় ক্যাফেটেরিয়ায় টেবিল পেতে লাইন দিতে হয়। হাবুদা চারটে বেগুনি আর দুটো চা দাও।"

"না না। আজ এই ক্যালর-ব্যালোরের মধ্যে বসতে ইচ্ছা করছে না। আমার বাড়িতে এসো বরং, চা খেয়ে যাও।"

একটা তালঢ্যাঙা চ্যাঙড়া কস্তুরীর দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, "ভিড়ে পোষাচ্ছে না? নিরিবিলি চাও? সকালবেলাতেই ফুর্তির ফোয়ারা বসাবে নাকি মান্তু? সন্ধ্যেটা ফ্রি থাকলে আমাদের কাছে এসো না, সব পুষিয়ে দেব।"

"একদম বাজে কথা বলবেন না। মিনিমাম ভদ্রতাটুকু নেই। এদের জন্যই আমি এখানে বসতে চাইছিলাম না। এখন বুঝেছ তো? শুধু শুধু এইসব নোংরা কথা শুনতে হল।" কস্তুরী বেশ শান্ত মিষ্টি মেয়ে। এভাবে রেগে গলা চড়িয়ে কথা বলতে দেখেনি অরবিন্দ।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ থাক। চল যাই।" অরবিন্দ কস্তুরীর বাহু ধরে টান দিল।

ঐ দলের আর একজন উঠে এসে বলল, "মেয়েছেলের হাত ধরে টানাটানি করছিস। তার বেলা কিছু নয়। আর আমার ফ্রেন্ড দুটো রসিকতা করল তো ইজ্জত খসে গেল?" ছেলেটা সোজা কস্তুরীর অন্য হাত ধরে টান লাগাল।

"এ কী? এ কী অসভ্যতা! ছাড়ুন বলছি হাত। আমি কোথায় বসব, কার সাথে চা খাব আমার ব্যাপার। আপনারা মাথা গলানোর কে? হাবুদা কিছু বলুন। দেখছেন তো কী করছে।"

হাবুদা মন্তব্য করল, "শালা, মেয়েছেলে থাকা মানেই ঝঞ্ঝাট!"

বাকিরা কেউ কিছুই বলছে না। গুনগুন করে যে আওয়াজটা হল তাতে মনে হল হাবুর কথাটা একাধিক সমর্থন পেল। অরবিন্দও চুপ। সে কস্তুরীর হাত ছেড়ে দিয়েছে।

কস্তুরী স্তম্ভিত হয়ে অরবিন্দের দিকে তাকাল, "তুমিও কিছু বলবে না? আমাকে এখানে নিয়ে এসে এখন বিপদে ফেলে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে?"

"তুমি চুপচাপ ঐ কোণার টেবিলে ওয়েট করলে এত কথা হোত না। তা নয়, ঘটা করে নিজের চলে যাওয়াটা অ্যানাউন্স করে ওদের প্রভোক করলে।"

"আমি প্রভোক করেছি? তোমাকে দোকানে ঢোকার আগেই বললাম এখান থেকে চল যাই। ছেলেগুলোর হাবভাব দেখেই সুবিধের নয় মনে হয়েছিল। আমরা ভেতরে ঢুকলে কি ওরা টিজ করত না? এত স্পর্ধা আমার গায়ে হাত দিচ্ছে!" কস্তুরী উত্তেজনায় কাঁপছিল।

"গায়ে তো হাতই দিয়েছি সোনা। অন্য কিছু তো নয়। খিক্‌খিক্।" ঢ্যাঙার মন্তব্যে দলের সবকটা মিলে বিকট হাসতে শুরু করল। দোকানের ভেতরে খদ্দেরের ভিড় কমে গেল; বাইরে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগল।

হাবুদা গজগজ করল, "মেয়েছেলে রোজগার করলে ধরাকে সরা

জ্ঞান করে।" কী আশ্চর্য! লোকটা সব দেখেও ছেলেগুলোকে কিছু বলছে না। কস্তুরীর ওপর ঝাল ঝাড়ছে, যে নিয়মিত আসে। আরও আশ্চর্য– অরবিন্দের প্রতিবাদের সাহস না থাকুক, কস্তুরীকে দোষ দিয়ে পালানোর পথ খুঁজছে?

"এবারের মত ছেড়ে দিন। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিই।" বাপ্‌রে অরবিন্দ অনেক সাহস দেখিবে ফেলল তো!

"আমরা কি খুকিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি না?"

অকস্মাৎ জনতার জটলা ভেদ করে এক সুদেহী যুবক বেরিয়ে এল। আততায়ীর কব্জি চেপে ধরে কস্তুরীর হাত ছাড়িয়ে নিল ওদের হাত থেকে। বলল, "দাদা তুই কস্তুরীদিকে নিয়ে চলে যা; আমি এদের দেখছি কত বড় মস্তান। চিন্টু– সুজয়কে খবর দে তো।"

সুজয় আসার আগেই তিনটে ছেলেকে দোকান থেকে টেনে বের করে মেরে পাট করে দিল ইন্দ্রজিৎ। বাকিরা আক্রোশে কাপ-প্লেট ভেঙে, চেয়ার হাতে নিয়ে আক্রমণ করতে এল ইন্দ্রজিৎকে। অরবিন্দ সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে? কিন্তু ভাইকে সাবধান করার মত গলার জোরটাও নেই। কস্তুরীর উদ্দেশ্যে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, "তোমার জন্য এই ঝামেলার উৎপত্তি। ছেলেগুলোকে গালাগাল না দিয়ে ভদ্রভাষায় বলা যেত না? বোলতার চাকে ঢিল ছুঁড়েছ। এবার দেখ, কদ্দুর গড়ায়। চলে এসো।" হাত ধরে টানল অরবিন্দ।

কস্তুরী এক ঝট্‌কায় ছাড়িয়ে নিল। "আর যার সাথে যাই, তোমার সঙ্গে তো নয়ই। আর কাউকে আমার জন্য বিপদে পড়তে দেখে তোমার মত পালিয়ে যেতে আমি পারব না। ছোটন, তোমায় চেয়ার তুলে মারতে আসছে!" কস্তুরী চেয়ার মাথায় ছেলেটাকে ঠেলার চেষ্টা করল। বাকিরা ওকে যাচ্ছেতাই ভাবে জড়িয়ে ধরল।

সুজয় আর সম্মিলনীর কতগুলো ছেলে চলে এসেছে। অত বড় হাট্টাকাট্টা চেহারা নিয়ে সুজয় এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। অতনু তার প্যানপ্যাকাঠি চেহারা নিয়ে চিতার মত অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি তনয়। সুজয় সামান্য খাঁকারি দিল দল ভারি হতে, কিন্তু ষোলো ইঞ্চির বাইসেপস্‌ওয়ালা হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। মাথা বাঁচলেও চেয়ার কাঁধে লেগে ইন্দ্রজিতের মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল।

"তোমার পরিচয় পেয়ে গেছি। আমার সঙ্গ পাবে বলে এখানে নিয়ে এসে কতগুলো ইতর হুলিগানের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ? নিজের ভাইকে দেখ।"

"ওর শিভল্‌রি দেখানো বেরিয়ে যাবে। গুণ্ডা-বদমাশদের সঙ্গে যেচে কেউ লাগে? ওদের কাছে ছুরি-ছোরা, আর্মস থাকে। ক্যারাটে শিখে হিরোগিরি দেখাচ্ছে।"

"ছিঃ! প্রতিবাদ করার সাহস সবার থাকে না। যা ঘটছে চারদিকে, সেটা করা নিরাপদও নয়। কিন্তু নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কখনও আমাকে দোষারোপ করছ, কখনও নিজের ভাইকে। আমি কিন্তু ছোটনের সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। ও মাগো!! ছোটন সাবধান!"

সুজয় এসে আক্রমণকারীকে অনুনয়ের ভঙ্গীতে পেছন থেকে জাপটে ধরল। "ভাই কী হচ্ছে কী? শান্ত হও। শুধু শুধু।" সুজয়ের দুই বাহুর আলিঙ্গনে একসাথে দু'জন চ্যাঙড়া চলৎশক্তিহীন হয়ে গেল। অথচ ঐ বিশাল দেহ আর বল নিয়ে সে এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। ও আগে এগিয়ে এলে ইন্দ্রজিতের আঘাত লাগত না, অতনুর মুখ মাথা ফেটে কনুই কেটে রক্তারক্তি হোত না। সুজয় ছাড়া অল্প-বিস্তর চোট লেগেছে এ পাড়ার যে ছেলেগুলো এগিয়ে এসেছিল তাদের সবারই।

অরবিন্দের সঙ্গে এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নয় দেখে, কস্তুরীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুজয় রিকশা ডেকে চড়ে বসল। কস্তুরী ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি একাই যেতে পারব। তার আগে আমার জন্য যারা ইনজিওরড্ হোল তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।"

ইন্দ্রজিৎ কস্তুরীর সঙ্গে বাড়ি ফিরতে অরিন্দমের কী ঝাঁজ! "ক্যারাটে ব্ল্যাক বেল্ট, বীরত্ব দেখানোর হাতে গরম পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল তো? ইস্! এমন দয়াময়ী সাহসিনী আর দু'চার পিস থাকলে ঐ ইভটিজিং-এর প্রোটেস্ট করা ছোকরাগুলোকে বেঘোরে মরতে হোত না।"

কস্তুরী মুখ খুলল, "নিজের ভাইয়ের ঐ ছেলেগুলোর মত পরিণতি হোক চাইছিলে মনে হচ্ছে!" "আমাকে ভদ্রলোকের মত খেটে খেতে হয়। বাপের হোটেলে থেকে আর ভাইয়ের অন্ন ধ্বংস করে মারামারি শেখার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। আর লম্বা-চওড়া মাসল বাগানো বডি নিয়ে হিরোইজ্‌ম দেখাতে কার না সাধ যায়?"

"দাদা, অন্যায়ের প্রোটেস্ট করতে সবার আগে যেটা দরকার হয় সেটা হল মেরুদণ্ড। স্ট্রিট-ফাইটিং-এর জন্য মাস্‌লের চেয়ে আগে দরকার কল্‌জে। অতনুকে দেখলি না? ঐ নিঙলে চেহারা নিয়ে কীভাবে ফুঁসে উঠল? তনয়, বাপি এরাও কেউ ব্রুস লী বা হলিফিল্ড নয়। ওদিকে সুজয় আমার দেড়া চেহারা নিয়ে চুপচাপ আমাদের মার খেতে দেখে গেল। ওরা কোণঠাসা হওয়ার পর শালা মিটমাট করতে ময়দানে নামল। না হলে সবকটাকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাতাম আমরা। কস্তুরীদি তো আগে অতনুকে হাসপাতালে অ্যাডমিট করার ব্যবস্থা করল। বাকিদেরও হসপিটালে ফার্স্ট্‌এইড দেওয়া হয়েছে।"

অরবিন্দ ভেতর ঘরে যাওয়ার আগে হিস্‌হিসিয়ে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথা ছুঁড়ে দিয়ে গেল, "সবচেয়ে উপাদেয় পদটা শেষপাতের জন্য তোলা থাকে।"

কস্তুরী চোয়াল শক্ত করে তারপর চোখ বুঁজিয়ে রাগের সঙ্গে বোধহয় খানিকটা কান্নার দলাও গিলে ফেলল। তারপর ধরা গলায় বলল, "মাসিমা, এলাম। ডাক্তার কিন্তু গরম জল নয়, আইস্ কম্প্রেস করতে বলেছেন। হট ওয়াটার ব্যাগ থাকলে তার মধ্যেও বরফ ভরে নিতে পারেন। ডাক্তারবাবু এক্সরে প্লেট দেখে নিয়েছেন, কিন্তু ক্লিনিক থেকে রিপোর্টটা আজ সন্ধ্যেবেলায় কালেক্ট করতে হবে। ওষুধগুলো মনে করে খেও ছোটন। আর পরের কথা– ভগবান দুটো কান দিয়েছেন কেন জান তো?" তারপর নিজেকেই বলল, "আমি ভেবে পাই না, মেয়েরাই যেখানে টার্গেট হয় সেখানে তাদের নিদেন পক্ষে সেল্‌ফ ডিফেন্সটুকু শেখারও ব্যবস্থা থাকে না বেশিরভাগ জায়গায়। আসলে অ্যাটাক করে ভয় না দেখাতে পারলে রেসকিউ করে ছেলেরা বীরত্বই-বা দেখাবে কোথায় আর কথাই শোনাবে কী করে?"

বাকিদের কাটা ছড়া, হাড়ে ফাটল ধীরে ধীরে সেরে গেলেও ইন্দ্রজিতের কাঁধের ব্যথাটা ছ'মাস পরেও পুরোপুরি গেল না। এখনও বাজার দোকান করে, মানে করতে হয়। কিন্তু ডান হাতে বা কাঁধে ভারি ব্যাগ নিলেই পুরো হাতটাই খচ্‌কা লেগে অবশ হয়ে আসে। কস্তুরী জোর করে কিছুদিন ওর চিকিৎসার খরচ চালিয়েছিল। বাড়ি এসে খোঁজ করে যেত মাঝে মাঝে। অরবিন্দর উপস্থিতি বা প্রতিক্রিয়া যেন দেখতেই পেত না। রিক্‌শায় বসিয়ে সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত।

অতনুরা ওদের একসঙ্গে দেখে একবার দুই আঙুলে 'দারুণ' মুদ্রা ফুটিয়ে মন্তব্য ছোঁড়ে, "বস্, সচীনের চেয়ে অঞ্জলি সাত বছরের বড়, অভিষেকের চেয়ে ঐশ্বর্যও দু-তিন বছরের বড়।" বুকের ভেতরটা যে একটু শিরশির করেনি তা নয়। দাদার বান্ধবী বলে কস্তুরীকে দিদি ডাকে, না হলে বয়সের ফারাক তেমন কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুদের রসিকতায় কস্তুরীর সাহস ও সহানুভূতি দুটোর প্রবাহই শুকিয়ে গেল। রাস্তাঘাটে চোখাচোখি হলে, "ভালো?"– এর বেশি আর বাক্যালাপের অবকাশ দেয় না।

কাঁধের ব্যথাটা এমনিতে নিয়ন্ত্রণেই থাকে, কিন্তু ডাক্তার ও ফিজিওথেরাপিস্টের দেখানো ব্যায়াম ছাড়া আর কোনও কসরত করতে গেলেই হাত নড়ানো, ঘাড় ঘোরানোর উপায় থাকে না বেশ কিছু দিন। ওয়েট ট্রেনিং তো নৈব নৈব।

বিনোদদা চলে গেছেন চার বছরের ওপর। সুজয় এখন সম্মিলনী ক্লাবের সুজয় স্যর। কস্তুরী কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে। দেখা তো দূর ফোনেও কথা হয় না আর। নতুন নম্বরও নেওয়া হয়নি। চাকরির পরীক্ষা সাক্ষাৎকারের ছোটাছুটির মধ্যে দেহটাকে যোগাসন করে সচল রেখে চলেছে। কাঁধে মাঝে মধ্যে চিড়িক মারা চিনচিনে ব্যথার মত দাদার এখনও অব্দি চালিয়ে যাওয়া তির্যক মন্তব্যগুলোও যেন জিইয়ে রেখেছে কিছু গোপন গর্বের স্মৃতি– চার বছরের তদ্দাত মার্শাল আর্ট সাধনা অথবা কাঁধে কস্তুরীদির হাতের স্পর্শ, "ছোটন পেইনকিলার বেশি খেয়ো না, সেঁক নিও। তুমি আবার প্র্যাকটিস শুরু করতে না পারলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হবে।"

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ছোটগল্পকার

ভ্রমণ

চোখজুড়ানো খাজুরাহো

অমিতাভ ঘোষ

ভারতবর্ষের যে ক'টি পর্যটনকেন্দ্রে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বিদেশী পর্যটক ভিড় জমান তার মধ্যে খাজুরাহো অন্যতম। ১৯৮৬ সালে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্গত হওয়া এই স্থানটির হাতছানি উপেক্ষা করা ভীষণ কঠিন। তাই আমাদের মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের শুরুটাই ছিল খাজুরাহো দর্শনের মধ্য দিয়ে। প্রায় ৬০০ বছর বনজঙ্গলে ঢাকা, মাটি চাপা পড়া অবস্থায় আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে ছিল খাজুরাহো। ১৯২৩ সালের খননে যখন খাজুরাহোর বিস্ময়কর ভাস্কর্য লোকচক্ষুর সামনে আসে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ৮৫টি মন্দিরের বেশিরভাগই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অযত্নে, অবহেলায় নষ্ট হয়ে মাত্র ২২টি মন্দির ভারতীয় শিল্পকীর্তির অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য অক্ষত আছে।

দিন গুনতে গুনতে একদিন প্রতীক্ষার অবসান হল। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমাদের যাত্রা শুরু। প্রথমে হাওড়া থেকে ট্রেনে সাতনা। খাজুরাহোর নিকটতম বড় রেলস্টেশন সাতনা খাজুরাহো থেকে প্রায় ১১৭ কিমি দূরে অবস্থিত। সাতনা থেকে খাজুরাহো যাওয়ার পথে ঘণ্টা কয়েক পান্না অরণ্যের সৌন্দর্যের স্বাদ নিয়ে যাব এটাই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। কিন্তু হাওড়া-ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেস প্রায় ৫ ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছলে পান্না অরণ্য দর্শনের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। সাতনা রেলস্টেশন থেকে খাজুরাহো পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। রাতে গরম ভাত, চিকেনকারি, আলুপোস্ত দিয়ে ডিনার সেরে সোজা লেপের তলায়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে খাজুরাহোতে ঠাণ্ডাটা বেশ উপভোগ্য। পরের দিন সকালে শতাধিক টিয়াপাখির কলরবে ও আমার এক সঙ্গী তরুণের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। আসলে আমাদের হোটেল কৃষ্ণা কটেজের পাশে বিশাল বৃক্ষগুলি টিয়াপাখিদের স্থায়ী ঠিকানা। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা গাড়িতে ওঠার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, এখানকার অক্ষত থাকা ২২টি মন্দিরকে সঠিকভাবে দেখতে হলে ২২দিনও পর্যাপ্ত সময় বলে নাও মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের অত সময় কোথায়? কাজেই এখানে অন্তত দু'রাত কাটাবার পরিকল্পনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মন্দিরগুলি সমগ্র খাজুরাহো জুড়ে ছড়িয়ে থাকার জন্য এদের কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেইমত পর্যটকেরা দর্শন করেন। পশ্চিমগোষ্ঠীর মন্দিরগুলির মধ্যে রয়েছে– ৬৪ যোগিনী মন্দির, লালগুঁয়া মন্দির, মাতঙ্গেশ্বর মন্দির, বরাহ মন্দির, লক্ষ্মণ মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, পার্বতী মন্দির, চিত্রগুপ্ত মন্দির, জগদম্বা মন্দির, মহাদেব মন্দির, কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দির। পূর্বগোষ্ঠীর মন্দিরগুলি হল– হনুমান মন্দির, ব্রহ্মা মন্দির, বামন মন্দির, জওয়ারি মন্দির, ঘণ্টাই মন্দির, জৈন মন্দির। দক্ষিণ গোষ্ঠীর মন্দিরের মধ্যে দুলাদেও ও চতুর্ভূজ মন্দির উল্লেখযোগ্য।

প্রথমেই আমরা পশ্চিমগোষ্ঠীর মন্দির দর্শনের জন্য মূল প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম। এখানকার মন্দিরগুলির আকর্ষণই সর্বাধিক। প্রবেশমূল্য দশ টাকা। পুরো জায়গাটা সংরক্ষিত। প্রবেশের আগেই গাইড নিয়ে নিলাম। আমরা মেটাল ডিটেক্টরের নেওয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। নিমেষে চোখ জুড়িয়ে গেল। সমগ্র এলাকাটি অতি যত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। চারদিক সবুজ, তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় মাথা উঁচু করে রয়েছে অতীতের অজানা শিল্পীদের হাতে গড়া বিস্ময়।

দর্শনকালে আমরা পুরোপুরি গাইডের নিয়ন্ত্রণে চলে এলাম। শুরু হল ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা স্থাপত্য. ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার পালা। সত্যি বলতে কি, প্রতিটি মন্দিরের প্রতিটি শিল্পকর্মের বর্ণনা দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। তাই সামগ্রিকভাবে যেসব মূর্তি, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আমাদের আজীবন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবে আমি তাদের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

গাইডমশাই আমাদের যেখান থেকে দর্শন করানো শুরু করলেন সেটি হল বরাহ মন্দির। চারপাশে দেওয়ালহীন এক ছোট মন্দির। নগ্নপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দর্শন করলাম ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম–

বরাহের। ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই মন্দির। শুনে বিস্মিত হলাম যে, পৌনে ন'ফুট লম্বা ও পৌনে ছ'ফুট উচ্চতার বরাহ মূর্তিটি একটিমাত্র পাথরে তৈরি। শুধু তাই নয়, মূর্তিটির গায়ে ৬৭৪টি দেবদেবীর মূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করা আছে যা দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

বরাহ মন্দিরের একদম সামনেই লক্ষ্মণ মন্দির। ৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চান্দেলা বংশের রাজা যশোবর্মন নির্মিত এই মন্দিরটি আসলে একটি বিষ্ণু মন্দির। এর সঙ্গে রামায়ণের লক্ষ্মণের কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার সুবিশাল মন্দিরগুলিকে দূর থেকে দর্শনের সময় তার গঠনশৈলীর সৌন্দর্যের স্বাদ অন্যরকম, আবার সেই একই মন্দির কাছ থেকে দর্শন করার সময় মন্দিরগাত্রের যে ভাস্কর্য তার স্বাদ অন্যরকম। লক্ষ্মণ মন্দিরের এই মূর্তি খাজুরাহো মন্দির প্রাঙ্গণের অনেক জায়াগাতেই আছে। লক্ষ্মণ মন্দির দর্শন শেষে আমরা হাজির হলাম কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরের সামনে। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারাজা বিদ্যাধর এই মন্দির নির্মাণ করান। ১০৯ ফুট লম্বা, ৬০ ফুট চওড়া ও মাটি থেকে ১১৭ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন এই মন্দিরের ভিতরে ২২৬টি ও বাইরে মন্দিরগাত্রে ৬৪৬টি মিলে মোট ৮৭২টি মূর্তি আছে যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। কাণ্ডারিয়া মহাদেবের দর্শন শেষে একটু এদিক ওদিক ছবি তুলতে না তুলতেই গাইডমশাইয়ের ডাকে চলে এলাম জগদম্বা মন্দিরের সামনে। ৭৭ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট চওড়া এই মন্দির রাজা ঢঙের পুত্র গণ্ড নির্মাণ করান। ৭৫ ফুট লম্বা ও ৫২ ফুট চওড়া চিত্রগুপ্ত মন্দিরের প্রধান দেবতা হলেন সূর্যদেব। দর্শন শেষে আমরা বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম। ১০০২ খ্রিস্টাব্দে যশোবর্মনের পুত্র ঢঙের নির্মিত এই মন্দির ৮৯ ফুট লম্বা ও ৪৬ ফুট চওড়া। বিশ্বনাথ মন্দিরের চত্বরেই লাগোয়া মন্দির হল নন্দীমন্দির। মন্দিরের ভিতরে আকর্ষণীয় বৃষমূর্তিটি লম্বায় সোয়া ৭ ফুট ও উচ্চতায় ৬ ফুট। শুনলাম এই বৃষমূর্তির কানের কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। সেইজন্য বৃষমূর্তির গলা জড়িয়ে ভক্তদের ভিড় লেগেই রয়েছে।

মন্দিরগুলির শিল্পভাস্কর্য এককথায় অসাধারণ মনোরম, প্রাণবন্ত, মনোমুগ্ধকর। শিল্পকলাগুলির রূপের ছটা যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে তা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা পাওয়া দেখেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সেই জলুসের আঁচ পেতে হলে এসে দাঁড়াতে হবে মন্দিরের সামনে। কি নেই এখানকার শিল্পকলায়! মানব জীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি দৃশ্যই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তেলা হয়েছে এখানকার মূর্তিগুলিতে। শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তা হয়ে উঠেছে জীবন্ত। সেই সময়কার মানুষদের শিকারযাত্রা, শোভাযাত্রা, আমোদপ্রমোদ, রণসাজে সজ্জিত সেনাবাহিনি, নৃত্যগীতরত নারী-পুরুষ, কর্মব্যস্ত শ্রমিক– সেই সময়কার সমাজজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছে। তখনকার নানান জীবজন্তু যেমন ঘোড়া, হাতিকে নানা কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে দেখানো হয়েছে আবার পশুপাখির নানা অনুভূতিকেও মর্যাদা দিয়ে মূর্তি তৈরি হয়েছে। নাগিনকন্যা, অপ্সরা, কীচকের মূর্তি, হর-পার্বতী, রামসীতাসহ অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তিও

এখানকার ভাস্কর্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। এখানকার নারী-পুরুষের মূর্তির জীবন্ত রূপ দিতে শিল্পীদের দক্ষতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মূর্তিগুলির শরীরের প্রতিটি অঙ্গের শারীরিক অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখে এদেরকে মূর্তি বলে মনে হয় না। আলাদাভাবে নারী মূর্তির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেমন তাদের দেহের গঠন তেমনি অপরূপ ভঙ্গিমা। এ যে রকমারী ভঙ্গিমায় নারীমূর্তির এক অনুপম প্রদর্শনী যা যোগ করে করে সুবিশাল মন্দিরের রূপ পেয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে এক নারীমূর্তির সামনে এসে গাইড বললেন– মূর্তিটি সামনে থেকে দর্শন করলে দেখবেন মুখ গম্ভীর অথচ পাশ থেকে দেখলে হাস্যময়ী বলে মনে হয়। সত্যিই ভারী আকর্ষণীয় এই মূর্তি! পশ্চিমগোষ্ঠীর মন্দিরগুলির মূর্তিগুলিতে মিথুন মূর্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ ও নারীর দেহমনের যাবতীয় কামনা, বাসনা ও অনুভূতির এক মনোরম প্রস্তরীভূত রূপ শিল্পীদের নিপুণ হাতের কারসাজিতে প্রাণের স্পর্শ পেয়েছে। প্রাকৃতিক কারণেই নর-নারীর আকর্ষণের যে নানান রূপ, তাদের ভাব-ভালবাসার অনভূতি ও কামকলার বাহ্যিক প্রকাশ, তার প্রতিটি পর্বের নিখুঁত সুন্দর মূর্তি চোখ টানতে বাধ্য। ছেনি-বাটালির সূক্ষ্ম স্পর্শে যে নারী-পুরুষের অনুভূতির প্রতিচ্ছবিও ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে তা সামনে থেকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সঙ্গমরত নর-নারীর মূর্তিগুলি এতটাই প্রাণবন্ত ও তাদের এমনই অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গিমা যে আইপ্যাড হাতে নবীনা বিদেশিনীকেও থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখেছি। মিথুন মূর্তি ছাড়াও সিক্তবসনা সুন্দরী নারী, দর্পণের সামনে প্রসাধনরতা সুন্দরী, পায়ে বিদ্ধ কাঁটা তোলার ভঙ্গিমাতে নারী– এদের সৌন্দর্য চিরকালীন। তবে একটা কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, এখানকার নারী মূর্তির ভাস্কর্যে যে অনিন্দ্যসুন্দর স্বাস্থ্য, উন্নত বক্ষ, স্ফীর্ণ কটিদেশ নিয়ে শারীরিক গঠন, পেশীর ভাঁজ, অপরূপ মুখশ্রী, রূপলাবণ্য, কেশবিন্যাস, হাত, পা, গলা, কোমর, কান, নাকের অলংকারসজ্জা, বেশভূষা, ব্যবহৃত প্রসাধনদ্রব্য শিল্পীদের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় এতটাই প্রাণবন্তভাবে ফুটে উঠেছে যে বর্তমান যুগের বিউটিপার্লারগামী আধুনিকারও ঈর্ষা হতে বাধ্য।

পশ্চিমগোষ্ঠীর মন্দির দর্শন শেষ করে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য হোটেলে ফিরে আসতে হল। গাইডমশাইও খাওয়া সেরে আমাদের হোটেলে এলে আমরা পূর্বগোষ্ঠীর মন্দির দর্শনের জন্য চললাম। মূলত বামন মন্দির ও জৈন মন্দির নিয়ে পূর্বগোষ্ঠী। জৈন মন্দির অনেকগুলো তীর্থঙ্করের মন্দির নিয়ে সজ্জিত। পূর্ব ও দক্ষিণগোষ্ঠীর মন্দির দর্শনের জন্য কোন প্রবেশমূল্য দিতে হয় না। এদিকে দর্শনার্থীও পশ্চিমের তুলনায় কম। দক্ষিণের মন্দিরের মধ্যে দুলাদেও ও চতুর্ভূজ মন্দির বিখ্যাত। চতুর্ভূজ মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি একটু অন্যরকম– এই মূর্তির পা থেকে কোমর পর্যন্ত কৃষ্ণ, কোমর থেকে নারায়ণ ও মাথায় শিব। পশ্চিম গোষ্ঠীর মন্দিরের তুলনায় এখানকার মন্দিরগুলো অনেকটাই জলুসহীন বলে মনে হয়।

সূর্যাস্তের সময়ে আমরা গাইডমশাইকে বিদায় দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। এসেই আবার ব্যস্ত। বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাক, 'লাইট এ্যান্ড সাইন্ড' শো না দেখলে চলবে না। মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের ধারাভাষ্যে সন্ধ্যে ৭টার যে শো আমরা দেখছি তাতে গায়ে কাটা দিয়ে যাচ্ছে। ধারাভাষ্য ও আলোছায়ার যাদুতে আমরা যেন পৌঁছে গেছি চান্দেলা রাজত্বে। কে জানে হয়তো ক্ষুদিত পাষাণের মত কোন ঘটনা প্রতি রাতেই ঘটে চলে!

অমিতাভ ঘোষ ভারতীয় ভ্রমণলেখক

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

অনুবাদ গল্প

সুনামি

জয়ন্ত সাংকৃত্যায়ন

আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্যুরিস্টের একটি দল বেলাভূমিতে হাজির হল। তাদের সঙ্গে একজন গাইড। তারা গাইডের কথা শুনছিল। গাইডের হাতে একটা ছাপানো গাইডবুক। সে কথা শেষ করে বইটি থেকে তাদের কিছু একটা পড়ে শোনাচ্ছিল। আমি কিন্তু তা শোনার জন্য কান না পেতে তাকে দেখতে লাগলাম। তার পরনে রঙচটা একটা জিনসের প্যান্ট আর গায়ে টি-শার্ট। শার্টটির সামনের দিকটা জাপানী অক্ষরে কী সব ছাপানো! সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসে তার কালো চুল উড়ছে। গাইড ছেলেটির গড়ন হালকা-পাতলা। তার কাঁধে ঝুলছে চামড়ার একটা ব্যাগ। আমি ভেবে পেলাম না সে ওটার মধ্যে কী ভরে রেখেছে! তাকে দেখে মনে হল, শৈশব থেকেই সে ওখানে বড় হয়েছে। তার মুখটা উস্কখুস্ক আর বিষণ্ণতায় ভরা, তাই তার মুখে লেশমাত্র হাসির আভাস নেই।

প্রথম সুনামি সাগরের উপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি সাগরের বিশালতার দিকে চেয়ে রইলাম। সুনামি কয়েক মাইল উঁচু হয়ে ধেয়ে আসছে। সুনামিটি যেন আকাশের কালো মেঘের গভীরতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল, আর মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

আমি চারদিকে তাকালাম। ট্যুরিস্টের দলটিকে মনে হল তারা পারিবারিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ, পরস্পরের অন্তরঙ্গ। মধ্যবয়সী তিনটি দম্পতি। পুরুষ তিনটির গায়ে একই ধরনের সাদা শার্ট আর মাথায় হ্যাট। দু'জন তরুণী, বান্ধবী নতুবা একই অফিসের সহকর্মী হবে হয়তো। এটা তাদের জীবনের প্রথম ছুটিতে বেড়াতে আসাও হতে পারে। বছর তিরিশেক বয়সী একজন কালো চেহারার লোকের সঙ্গে বছরদশেকের একটা ছেলে। সম্ভবত লোকটিরই ছেলে। তারা মন দিয়ে গাইড ছেলেটির কথা শুনছিল। পেছন ফিরে আমি লোকটার দিকে একনজর তাকালাম। আমরা সমুদ্র থেকে শ'খানেক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই বস্তির পাশে ছোট্ট একটা বাজার। কমপক্ষে তিরিশটি কুঁড়েঘরের একটা বস্তি। কুঁড়েঘরগুলো ভাঙাচোরা গ্যালভানাইজড সিটের অংশ, জাহাজের অকেজো তক্তা, ভাঙা বাঁশের আড়া, পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের পানির ট্যাঙ্ক ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। এমন কি বালির মধ্যে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত ইন্টারসিটি বাসের মধ্যেও কেউ কেউ বাসা বেঁধেছে। একদল ছোট ছেলেমেয়ে তাদের ঘরগুলোর সামনে খেলাধুলো করছে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত হাসাহাসির শব্দ অল্পস্বল্প কানে ভেসে আসছে।

আমাদের পিছনে অল্প একটু দূরে সৈকতের ধার ঘেঁষে একটি রাস্তা চলে গেছে। মাত্র শ'দেড়েক গজ দূরে পাহাড়ের ঢালুতে ঝোপঝাড়। সেখানে বুনোফুলের অপূর্ব সমারোহ।

আমি ট্যুর গাইডের দিকে তাকালাম। সে-ও আমাকে কিছু বলবে বলে আমার দিকে তাকাল। আমি তার দিকে প্রথম তাকিয়ে তার বিষণ্ন চোখ দুটো দেখতে পেলাম। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে বলা তার অস্পষ্ট কথা আমার কানে এল।

"মাঝে-মধ্যে সামুদ্রিক টেউ সুনামি সমুদ্রতলে আছড়ে পড়ে। তারপর তা সমুদ্রের উপকূলে আঘাত হানে। টেউ উঁচু থেকে উঁচু হয়ে ধেয়ে আসে।" কথা থামিয়ে সে অন্য দিকে না তাকিয়ে তাদের কাঁধের উপর দিয়ে তার আঙুলটি উঁচিয়ে সমুদ্রের দিকটা দেখাল। "ওই যে আসছে।"

আমরা দিগন্তরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সমুদ্রের সবুজ জলরাশির উপরটা সাদা ফেনায় ভরে উঠছে। খুব ধীরে ধীরে সফেদ ফেনা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখনো সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি আর দৌড়াদৌড়ি করছিল। আমাদের দৃষ্টিগোচর হল শ'খানেক ফুট উঁচু হয়ে ঢেউ সামনের দিকে ধেয়ে আসছে।

"আমি ভাবছি, এখন আমাদের উঁচু জায়গায় চলে যাওয়া উচিত।" গাইড ছেলেটি বলল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পেছনে যে রাস্তা চলে গেছে সেদিকে চলে যাবার জন্য সে ইঙ্গিত করল। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রসৈকতে আছড়ে পড়ার আগে ট্যুরিস্টের দলটির সঙ্গে আমিও ওখান থেকে সরে পড়ার জন্য রওনা হলাম। রাস্তাটা পার হবার আগে আমাদের থামতে হল বড়সড় আকারের একটি ট্রাককে আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাবার সুযোগ দেবার জন্য। পরমুহূর্তে মাটি যেন সামান্য পরিমাণে কেঁপে উঠল। সমুদ্রের ঢেউ অনেক অনেক উঁচু হয়ে ধেয়ে আসছে! আমি সেদিকে তাকালাম। তার আগে ঢেউ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু এখন মনে মনে হল তা উত্তাল আকার ধারণ করে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

আমরা রাস্তাটি পার হয়ে পাশের পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। ট্যুরিস্টদের মাঝ থেকে দু'জন তরুণী উপরে উঠে হাসতে শুরু করল। তাদের হাসি দেখে মনে হল তারা ওখানে উঠতে পেরে উৎফুল্ল। পাহাড়ের ঢাল খাড়া না হওয়ায় আমাদের উপরে উঠতে দম যে বন্ধ হয়ে যায়নি, এটাই রক্ষে। আমরা পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো দ্বীপটাকে দেখতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে নিচের দিকের পাহাড়ের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করল।

কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটা বড় শহর আবছা আবছা চোখে পড়ল। দূরের গাছপালাগুলো ছোটছোট বিন্দুর মত নজরে এল। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। আমি আবার সাগরের দিকে তাকালাম। আমার বাঁদিকে পাহাড়ের একটা ঢালু সমুদ্র সৈকতের দিকে নেমে গেছে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে হাইওয়ের পাশ দিয়ে সংকীর্ণ ম্যানগ্রোভের বন। লাল রঙের একটা ছোট্ট গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে গেল। গাড়িটাকে অস্টিন মিনি কুপার বলে মনে হল। আমি গাইডটির দিকে তাকালাম। সে-ও আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমরা কেউই কারো সঙ্গে কথা বললাম না।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। আমি ধারণা করতে পারলাম না আমরা কতটা সময় ওখানে ওইভাবে রয়েছি। গাইডটি কোন কথা বলছিল না। ট্যুরিস্ট দলের লোকগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঝেমধ্যে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়াতে দেখলাম। তাদের মধ্যে থেকে মাঝবয়সী একজন মহিলা আপনমনে গান গেয়ে গেয়ে পাহাড়ি ফুল তুলতে লাগল। আর এদিকে তার সঙ্গের পুরুষটি তার দামী ক্যামেরা দিয়ে মহিলাটির ছবি তুলতে শুরু করল।

আমি পাহাড়ের আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। জল আমাদের পাহাড়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছ গেছে। আমি পাহাড়ের নিচের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র সৈকত, রাস্তা ও বস্তির বাজারটা আর দেখতে পেলাম না। জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে কিংবা জলের নিচে তলিয়ে গেছে। আমাদের বাঁদিকের বেলাভূমি জলের নিচে। ওখানকার রেড অস্টিন মিনি আর ম্যানগ্রোভ গাছগুলো এখন আর চোখে পড়ছে না। জলের তোড়ে সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে।

এর মধ্যেই হালকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। দশ বছরের ছেলেটি তার গোমড়ামুখো বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। "সুনামী একা আসে না। তারা জোড়া বেঁধে আসে। তাড়াতাড়িই দ্বিতীয়টা এসে পড়বে। আমাদের আরো উচুঁতে পৌঁছতে হবে।" গাইড ছেলেটি বিষণ্নতা মেশানো মিষ্টি হেসে বলার চেষ্টা করল। "কিন্তু এখানে এই পাহাড়চূড়ার চেয়ে আর উঁচু জায়গা নেই।"

প্রথম সুনামি সাগরের উপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি সাগরের বিশালতার দিকে চেয়ে রইলাম। সুনামি কয়েক মাইল উঁচু হয়ে ধেয়ে আসছে। সুনামিটি যেন আকাশের কালো মেঘের গভীরতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল, আর মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ নীরবে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। জলোচ্ছ্বাস মুহূর্তের মধ্যে বিশাল দেহ ধারণ করে আমাদের চোখের সামনে সবুজের সব আস্তরণ ঢেকে দিল।

অনুবাদ মনোজিৎকুমার দাস

লেখক পরিচিতি

জয়ন্ত সাংকৃত্যায়ন ভারতের তরুণ প্রজন্মের লেখক। তিনি সায়েন্স ফিকশন, বাস্তবভিত্তিক ছোটগল্পের লেখক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। পুনের এই অটোমোবাইল ডিজাইনারের জ্যাজ ও ক্ল্যাসিকাল গিটার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ এবং বিশ্ব ইতিহাসে অনুরাগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় লেখা Sunami গল্পটির জন্য তিনি ২০০৬ সালে *The Little Magazine* পুরস্কার লাভ করেন। Sunami গল্পে সুনামি জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র, সমুদ্রসৈকত আর সৈকতের গরীব বস্তিবাসীদের কুঁড়েঘর বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঋত্বিককুমার ঘটক

ঋত্বিককুমার ঘটক বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালনায় সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেনের সঙ্গে সমোচ্চারিত নাম। ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে বিখ্যাত এই বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক যেমন প্রশংসিত ছিলেন, তেমনি বিতর্কিত ভূমিকার কারণে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বহু চর্চিত একটি নাম।

ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ঢাকা শহরের হৃষিকেশ দাস লেনে। তাঁর মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী এবং বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক। তিনি বাবা-মায়ের একাদশ এবং কনিষ্ঠতম সন্তান। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ এবং '৪৭-এর দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের অগণিত মানুষ কলকাতায় আশ্রয় নেয়। এ সময় তাঁর পরিবারও কলকাতায় চলে যায়। শরণার্থীদের অস্তিত্বের সংকট তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করে যা পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্রে ছাপ ফেলে।

রাজশাহী কলেজ থেকে আই এ এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি এ পাশ করে ঋত্বিক ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম এ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে শিক্ষাজীবনে ইতি টানেন।

তাঁর সাহিত্যপ্রেমী বাবা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি কবিতা ও নাটক লিখতেন। তাঁর বড়ভাই খ্যাতিমান এবং ব্যতিক্রমী লেখক মনীশ ঘটক ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক এবং সমাজকর্মী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। মনীশ ঘটকের মেয়ে বিখ্যাত লেখক ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা।

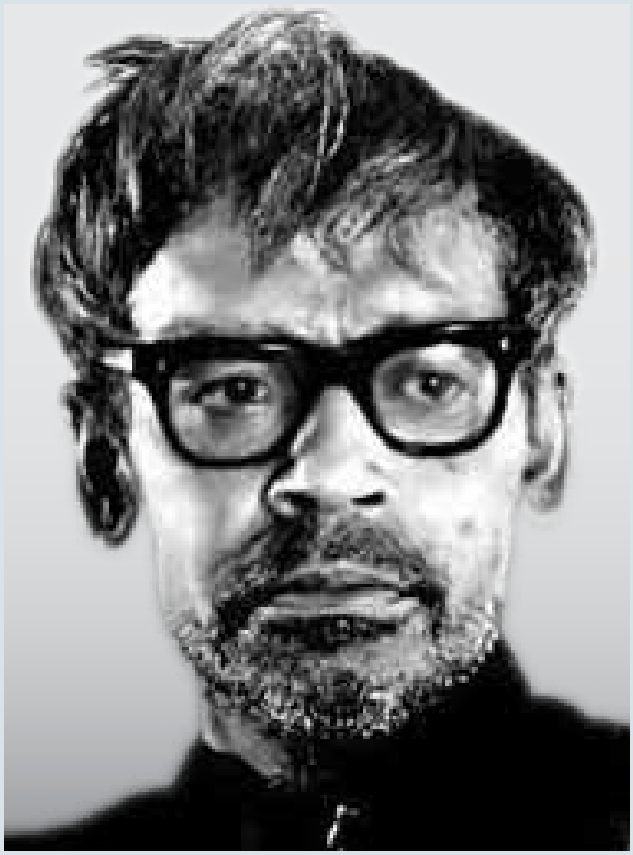

ঋত্বিক ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম নাটক *কালো সায়র* লেখেন। একই বছর তিনি *নবান্ন* নামে একটি পুনর্জাগরণমূলক নাটকে অংশ নেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ) যোগ দেন। এসময় তিনি লেখা ও পরিচালনা ছাড়াও নাটকে অভিনয় করেন এবং বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ও নিকোলাই গোগোল-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল* (১৯৫১) সিনেমার মধ্য দিয়ে; অভিনয় ছাড়াও এ সিনেমায় তিনি সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এর দু'বছর পর তাঁর একক পরিচালনায় মুক্তি পায় *নাগরিক*। দুটি চলচ্চিত্রই ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারাকে ঝাঁকুনি দিতে সমর্থ হয়েছিল।

তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্রের মধ্যে *মেঘে ঢাকা তারা* (১৯৬০), *কোমল গান্ধার*(১৯৬১) এবং *সুবর্ণরেখা* (১৯৬২) অন্যতম– এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে *কোমল গান্ধার* এবং *সুবর্ণরেখার* ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এ দশকে তাঁর পক্ষে আর কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে পুনের ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন ও ক্রমে ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। এখানে অবস্থানকালে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্মিত *Fear* ও *Rendezvous* নামে দুটি চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত হন।

সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রায় এক যুগ পর ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে পুনরাবির্ভাব ঘটে সত্তরের দশকে বাংলাদেশী প্রযোজকের অনুরোধে *তিতাস একটি নদীর নাম* নির্মাণের মধ্য দিয়ে। অদ্বৈত মল্ল-বর্মনের একই নামের একটি বিখ্যাত উপন্যাস তাঁর পরিচালনায় চলচ্চিত্ররূপ লাভ করে। ১৯৭৩ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ চলচ্চিত্র *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* (১৯৭৪) অনেকটা আত্মজীবনীমূলক একটি ভিন্ন ধাঁচের চলচ্চিত্র।

১৯৭৩ সালে *তিতাস একটি নদীর নাম* নির্মাণকালে ঋত্বিক ঘটক বলেন, "তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এ রকম লেখার দেখা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনীয় ঘটনাবলি, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সংগীতের টুকরো– সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল।... অদ্বৈতবাবু অনেক অতিকথন করেন। কিন্তু লেখাটা একেবারে প্রাণ থেকে, ভেতর থেকে লেখা। আমি নিজেও অদ্বৈতবাবুর চোখ দিয়ে না দেখে ওইভাবে ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। অদ্বৈতবাবু যে সময়ে তিতাস নদী দেখেছেন, তখন তিতাস ও তার তীরবর্তী গ্রামীণ সভ্যতা মরতে বসেছে। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে তিনি এর পরের পুনর্জীবনটা দেখতে যাননি। আমি দেখাতে চাই যে, মৃত্যুর পরেও এই পুনর্জীবন হচ্ছে। তিতাস এখন আবার যৌবনবতী। আমার ছবিতে গ্রাম নায়ক, তিতাস নায়িকা।"

১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে ২০০৭ সালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজিত দর্শক ও চলচ্চিত্র সমালোচকদের ভোটে *তিতাস একটি নদীর নাম* সেরা বাংলাদেশী ছবির শীর্ষে উঠে আসে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

০৭ জানুয়ারি ২০১৭ সন্ধ্যায় শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যায় মিস রাবেয়া আক্তারের একক পরিবেশনা

২৩ জানুয়ারি ২০১৭ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত গৌড়ীয় নৃত্য সন্ধ্যায় কলকাতার 'গৌড়ীয় নৃত্যভারতী'র সদস্যদের পরিবেশনা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra February 2017

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য
জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক,
টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন,
লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in
/IndiaInBangladesh
@ihcdhaka
/HCIDhaka